একাত্তরের স্মৃতিকথা এবং তারপর ..

মোলা বাহাউদ্দিন

কৈফিয়ত

(এখন আমি ৬৩ বছর পেরিয়ে গেছি। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি নিয়ে একটা লেখা লিখার ইচ্ছা অনেক দিন থেকে। লিখব লিখব করে লেখা হয়নি। স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধার কাজকর্ম স্বচক্ষে দেখেছি। প্রবাসে আছি ৩৪ বছর। প্রবাসে মুক্তিযোদ্ধার কর্মকান্ড কথাবার্তা চোখ দিয়ে দেখেছি, কান দিয়ে শুনেছি। কোন প্রশ্ন করিনি। যখন কোন অমুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দেয় তখন ভাবি সে একজন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক। তাতে উপকার ছাড়া অপকার কিছুই নেই। পরবাসে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিয়ে কোন সুযোগ সুবিধা নেবার সুযোগ নেই। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিয়েই তারা খুশি। তাতে কারো কিছু যায় আসে না। কিন্তু একজন অমুক্তিযোদ্ধা যখন একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাকে প্রশ্ন করে, 'আপনি আবার মুক্তিযোদ্ধা হলেন কবে' তখন তাদের মুখোশ উন্মোচন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং একজন মুক্তিযোদ্ধার দায়ীত্ব হয়ে পড়ে। নিউইয়র্কে রাজাকারের সহযোগিকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আর এক অমুক্তিযোদ্ধা পুরস্কৃতও করেছে। তাই দেখে প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস আমাকে লিখতে হল "স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক"। কানাডাতে এসে শুধু শুনেই যাচ্ছিলাম। কে কতবড় মুক্তিযোদ্ধা তা নিয়ে আমার মাথা ব্যাথা নয়। কিন্তু কিছু স্বঘোষিত মুক্তিযোদ্ধার অদ্ভুত কাহিনী এবং 'মহা মুক্তিযোদ্ধা' উপাধি শুনে চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় ছিলনা। তারা অনেক সময় সীমা ছাড়িয়ে যায়। কখনও তাদের প্রতিহত করা প্রয়োজন হয়ে পরে, ইতিহাসের প্রয়োজনে।
আমার স্ট্রোকের পর আমি অনেকটা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছি কিন্তু হারিয়েছি স্বরনশক্তি। এখন নাম মনে রাখতে পারি না। যে বস্তুটা আমি সর্বদা ব্যবহার করি, আমার সামনেই আছে তার নামটাও মনে করতে পারি না কোন কোন সময়। স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে অনেক নাম হয়ত বাদ পড়বে বা মনে করতে পারবনা তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থি)

--০---

২৩শে মার্চ ১৯৭১। আউটার স্টেডিয়ামে বঙ্গ বন্ধুর শেষ জনসভায় বজ্র কণ্ঠে ঘোষিত হল, "কাল থেকে ব্যাংক চলবে না, অফিস আদালত চলবে না, গাড়ী চলবে না .. .."। সভাশেষে দল বেধে বাসার পথে পদব্রজে চলছি। পথে তিল ধারনের স্থান নেই। চলতে চলতে ষ্টেট ব্যাংকের সামনে (বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক) এসেই ব্যাংক বিল্ডিংএর দিকে তাকালাম। ভাবলাম কাল অফিসে আসতে হবে না, আর বিহারি অফিসার মাছির (মশিউর রহমান) সাথে ঝগড়া করতে হবে না। এই ব্যাংকে আমার চাকরির আজ দ্বিতীয় বছর। প্রথম নিয়োগ পাবার চার মাস পর থেকেই আমার চাকরি টলমল করছে। এই বুঝি গেল! ব্যাংকে আমি এখন দাগী ঝগড়াটে। কোন বিভাগই আমাকে নেয় না। চাকরির শুরতেই যে বিভাগে আমাকে প্রথম দেয়া হল তার ছোট অফিসার থেকে উপরের সবই বিহারি। বাঙালির প্রতি তাদের ব্যবহারই আমাকে ঝগড়াটে করে তুলেছে। বিহারিদের প্রতি একটা বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে। যাক সে কথা পরে হবে। তাকিয়ে দেখলাম মিলিটারি পাহারাদার ঠিক পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। মাত্র এক সপ্তাহ হল তাদের এখানে

বসিয়েছে। তার আগে ব্যাংকের সিকিউরিটি পাহাড়া দিত। প্রত্যেক তলায়, প্রত্যেক গেইটে, বাইরে সব জায়গায় এখন মিলিটারি পাহাড়াদার। দেখলেই মনে একটা ভয়ের সঞ্চার হয়।

তখন থাকি বাসাবো। কমলাপুরের পথ ধরে চলেছি। রেল ষ্টেশনের কাছে আসতেই মাথায় একটা বুদ্বি এসে গেল। আরে! কাল থেকে তো রেল চলবে না! অফিসেও যেতে হবে না! কি মজা! তাহলে বাড়ী চলে যাই না কেন! মা-কে দেখিনা দু মাস হল। এ সুযোগে ঘুম্বে আসি। ভাবতে ভাবতে ষ্টেশনের কাছে এসে দেখি মানুষের ভীড়, ঠেলাঠেলি হৈচৈ চিৎকার। সবাই যাত্রী। টিকেট কাউন্টার বন্ধ। রেল গাড়ী ছাড়ছে না। গাড়ীর ড্রাইভার বোধ হয় আমার চেয়েও বেশি ফাকিবাজ। আমি তো কাল থেকে সুযোগ নেব, আর এই রেলগাড়ীর ড্রাইভার এখন থেকেই নিচ্ছে। রেল বন্ধ। সবগুলো রেলগাড়ী পাথরের মত দাড়িয়ে আছে। আমার সাথে ছিল জিয়া। (সিলেটের জিয়াউদ্দিন, পরবর্তীতে ঢাকা মিউনিসিপালিটির প্রধান ব্যবস্থাপক।) তাকে বললাম, জিয়া তুই বাসায় খবরটা দিয়ে দিস, আমি বাড়ী চললাম।

ষ্টেশনে আগত এই জনস্রোতের একটাই দাবী, এখন রেল চলতে হবে, বন্ধ হবে কাল থেকে। বঙ্গবন্ধু বলেছেন কাল থেকে রেল বন্ধ। তাহলে আজ রাতে চলবেনা কেন! এই ভীড়ের মাঝে দাড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝলাম। তাইত! এখন বন্ধ করা মানে বঙ্গবন্ধুর আদেশ অমান্য করা। সেই সময় একটা সুবিধা ছিল। এ ধরনের জনস্রোতে যে কেউ সাহস করে দাড়িয়ে কথা বলতে পারলেই সে হয়ে যেত লিডার মানে নেতা। তার পেছনেই জনস্রোত চলতে থাকে নদীর জলের মত। এমন অনেক নজীর আছে, বর্তমানে বাংলাদেশে এমন বেশ কিছু মহা নেতা এখন রাজনীতির মাঠে আছে। আমার তখন মনে হল বাড়ী যাওয়া আমার খুব প্রয়োজন। এই ঘন্টাখানেক আগেও এমন তীব্র টান অনুভব করিনি। যেই ভাবলাম বাড়ী যাব তখনই এটা হয়ে গেল জরুরী।

একটু দাঁড়িয়ে, দুএকজনের সাথে কথা বলে বুঝলাম ষ্টেশন মাষ্টার ইচ্ছে করলেই রেল চালাতে পারে। আমি বললাম, ভাইসব শুনুন .. । তখন ভাইসব কথাটার একটা বিশেষত্ব ছিল। সবাই কান খাড়া করে নেয় কিছু শোনার জন্য। বললাম, চলুন আমারা ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে যাই। তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন। আর যায় কোথায়! সবাই এক বাক্যে চলুন, চলুন বলে চিৎকার করে উঠল। আমি হয়ে গেলাম ক্ষনিকের নেতা। ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরের দিকে চললাম। আমার পেছনে মানুষের স্রোত। পেছনের অনেকেই জানে না, কোথায়, কেন, কে যাচ্ছে। কিন্তু জনস্রোত চলছে।

ষ্টেশন মাষ্টারের রুমে ঢুকলাম। পেছনে জনস্রোত। ষ্টেশন মাষ্টার বাইরে তাকিয়ে দেখলেন। তিনি হয়ত ভাবলেন আমি কোন ছাত্রনেতা। সেলাম দিয়ে বললাম, বাইরের এই হাজার হাজার মানুষের একটা দাবী, এখন একটা গাড়ী চলুক। তাছাড়া রেল তো কাল থেকে বন্ধ হবার কথা। এখন ঢাকা টু চিটাগাং একটা গাড়ী ছাড়ার ব্যবস্থা করুন। এসব হাজার হাজার মানুষের চিৎকার, গালাগালি বন্ধ করুন।

দেখলাম সহজেই কাজ হল। তিনি বললেন, দু নম্বর পাটফর্মের গাড়ীটা যাবে। আমি ব্যবস্থা করছি। শুনে এসব যাত্রীর মাঝে স্বস্থি ফিরে এল। হুর হুর করে সবাই আসন দখল করে নিল। আমিও এক কোনে একটু বসার জায়গা করে নিলাম।

গাড়ীটা শেষ পর্যন্ত ছাড়ল রাত নয়টায়। মুক্তিযুদ্ব শুরু হবার আগে এটাই শেষ গাড়ী। ঢাকা টু চিটাগাং। একটা বিশেষ গাড়ী। কোন টিকেটের বালাই নেই, টিকেট চেকার নেই। শুধু চালক। আমরা যাত্রীরা যেন সবাই ভিআপি। সারাজীন তো টিকেট নিলই, একটা গাড়ী না হয় টিকেট ছাড়া গেল তাতে এমন কি ক্ষতি! ভিতরে বসে তখনও বুঝিনি গাড়ীর যাত্রী কত হতে পারে। টংগী ছাড়িয়ে গাড়ী বাঁক নিতেই দেখলাম ভিতরে যত যাত্রী, তার দ্বিগুন উপরে। এই বিশেষ গাড়ীটা তার বিশেষত্ব নিয়ে প্রত্যেক যাত্রীকে তাদের বাড়ীর সামনে নামিয়ে দিয়ে যেতে যেতে রাত চারটার সময় পৌছল ভৈরব ষ্টেশনে। কতবার কোন কোন জায়গায় চেন টানা হয়েছিল তা মনে রাখার মন ছিলনা তখন। একসময় কিছুক্ষন ঘুমিয়ে নিলাম। অবশ্য আমি ইচ্ছে করে ঘুমাইনি। চোখ নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। চোখ খুলে দেখি গাড়ী আখাউরা

জংশনে থেমে আছে। আর মাত্র দুটা ষ্টেশন। তারপরই কসবা। আহ্, প্রায় এসে পড়েছি। তখন সকাল ছয়টা।

গাড়ী আবার চলল। আমার বাড়ী ইমামবাড়ী আর কসবা ষ্টেশনের মাঝ বরাবর। বাড়ী বরাবর গিয়ে চেন টানলেই আমার জন্য সুবিধা। তাছাড়া এই ট্রেনটা তো আমাদের জন্যই। বাড়ী বাড়ী পৌছে দেবার জন্য। আমার বাড়ী বরাবর আসতেই চেন টানতে যাব তার আগেই ট্রেন থেমে গেছে। বাহ্, খুব মজা তো! তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। গাড়ী চলে যাবার পর দেখলাম আমার আশেপাশের গ্রামের বেশ কয়েকজন। যে যার পথে যাচ্ছে। কেউ উত্তরে, কেউ দক্ষিনে, কেউ পশ্চিমে। আমি যাব পুবে। বর্ডারের দিকে। পুবের কোন মানুষ দেখলাম না।

এটাই শেষ এবং বোধ হয় প্রথম রেলগাড়ী হোম সার্ভিস দিল। সব যাত্রীকে তার বাড়ী বাড়ী পৌছে দিয়ে ২৩ তারিখে রওয়ানা দিয়ে ২৪ তারিখে সকাল সাতটায় পৌছলাম। কসবা পর্যন্ত পৌছতে লাগল দশ ঘন্টা। যেখানে ঢাকা থেকে সব ষ্টেশনে থেমে কসবা পৌছতে লাগে তিন ঘন্টা। কসবা থেকে চিটাগাং পৌছতে কত সময় লেগেছিল আমার জানা নিই। আলী আকবরের পাটিগনিতের ফর্মুলা নিয়ে অংক কষলে হয়ত কেউ বের করতে পারবেন।

ক্ষেতের আল ধরে সড়কে উঠলাম। বাড়ী পৌছলাম সকাল আটটার দিকে।

এই অসময়ে আগমন দেখে বাড়ীতে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। বললাম, ফ্রি গাড়ীতে আসলে এমন অসময়েই আসতে হয়। মায়ের এসব জানার প্রয়োজন নেই, আমি এসেছি তাঁর কাছে এটাই বড় কথা।

খেয়েদেয়ে দিলাম ঘুম। ঘুম থেকে উঠলাম বিকেল পাঁচটায়। উঠেই রেডিওটা ছাড়লাম। ঢাকায় যে থম থমে ভাব দেখে এসেছি তার কোন খবর আছে কিনা। না, নতুন কোন খবর নেই। পাড়া ঘুরে এবাড়ী ওবাড়ী করে ফিরলাম নয়টার দিকে। খেয়ে ঘুময়ে পড়লাম।

পরের দিন সারাদিন কাটালাম গ্রামের বন্ধুদের সাথে। রাজনীতি নিয়ে তর্ক বিতর্ক হল সারাদিন। আজ পঁচিশে মার্চ। তখনও অনুমান করা যায়নি ঢাকায় কি ঘটতে যাচ্ছে।

২৬শে মার্চ সকাল আটটার দিকে ঘুম থেকে উঠে দেখি মা ভাপা পিঠা প্রস্তুত করে রেখেছে। বলল, তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে আস। গরম গরম না খেলে মজা পাবে না। উঠানে তোমার চেয়ার দেয়া হয়েছে।

ঘরে না দিয়ে উঠানে কেন? এটা আমার ছোটবেলা থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে। শীতের দিনে রোদে বসে মুড়ি খেতাম। তারপর এটা শীতে বসন্তে বার মাসে দাড়াল। সকালে নাস্তা যাই হোক আমি উঠানে রোদে বসে খাই। এতে আমি কি মজা পাই তা নিজেই জানি না। মা জানে আমার নাস্তার জায়গাটা কোথায় হবে। তাই দুটা চেয়ার রাখা হয়েছে উঠানে। একটায় আমি বসব আর একটা টেবিল হিসাবে ব্যবহার করব।

হাতমুখ ধুয়ে এসে বসলাম উঠানে। পিঠা খাচ্ছি আর উঠানের কোনে মান্দার গাছের দিকে তাকাচ্ছি। বেশ কতগুলো লাল ফুল ফুটে আছে। একটা হামিং বার্ড এসে মধু সংগ্রহ করছে ফুল থেকে। প্রকৃতির সৃষ্টি! ফুলের উপর না বসেই, উড়ন্ত অবস্থায় মধু সংগ্রহ।

আমাদের সবচেয়ে আদরের, পরিবারের সবচেয়ে ছোট ভাই রিয়াজ। বললাম রেডিওটা নিয়ে আয়। সে নিয়ে এল এবং চেয়ারের এক পাশে রাখল। অন করে প্রথমে ঢাকা ষ্টেশন ধরতে চেষ্টা করলাম। কোন শব্দ নেই। মনে করলাম বোধ হয় ইথারের স্বল্পতা। আকাশবানী ঘুরাতেই অতি পরিচিত দেবদুলালের কন্ঠে ভেসে এল, "**বাংলাদেশে গৃহযুদ্ধ শুরু** হয়েছে.. .." আমার হাতের পিঠা হাতেই রয়ে গেল। একি হল! তাহলে রুখে দাড়িয়েছে! আমার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। চেয়ার থেকে উঠে পায়াচারি করছি। কি হল! কি হল! তবে কি ষ্টেট ব্যাংকে আর্মি দেখে যা সন্দেহ করেছিলাম তই হল! কোথায় কোথায় কি হল, কি হচ্ছে! আকাশবানী বলছে রাজারবাগ পুলিশ লাইন প্রায় নিশ্চিহ্ন! কত লোক মারা গেল!

এর মধ্যে মা আবার গরম পিঠা নিয়ে এল। এসে দেখল মাত্র একটা পিঠা খেয়ে আমি উঠে গেছি!

মায়ের অনুযোগ, একি উঠে গেলে কেন? পিঠা ভাল হয় নাই? তাহলে মুরগী বুনা নিয়ে আসি। আমি তো মনে করলাম কচি লাউয়ের তরকারি পছন্দ করবে। বস, বাবা, আমি নিয়ে আসছি।
না মা, তোমার পিঠা ভাল হয়েছে। এখন আর খেতে পারব না। পরে খাব। এসময় বাবা বেরিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আজকে কোন নতুন খবর আছে?
একটু চুপ করে থেকে বললাম, হা, আছে। ঢাকা এখন বধ্যভুমি।
বল কি! বাবা রেডিওতে খবর শুনতে বসে গেলেন।
আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বৃটিশবিরোধি আন্দোলনে যোগ দিয়ে বঙ্গ ভঙ্গে ব্যর্থ হয়ে স্বধীনতার পর নিঃস্ব হাতে বাড়ী এসেছেন। চাচা কোলকাতার বিখ্যাত আইনজীবি হাবিবুর রহমান চৌধুরী। তাঁর সংস্পর্শে থেকে বাবা দেশের কাজ করেছেন। এখনও তিনি রাজনৈতিকভাবে খুবই সচেতন। যখন তখন কংগ্রেসের কথা বার বার স্মরন করিয়ে দেন। আকাশবানীর খবর বার বার দিচ্ছে। বাবা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। বললেন, তাহলে আর একটা স্বাধীনতা দেখে যাবার সৌভাগ্য হবে আমার।
অনেকক্ষন অস্থিরভাবে পায়াচারি করে আবার চেয়ারে বসলাম। বসতে পারলাম না। মনে হল এখনি বোধ হয় আমার কোথাও যেতে হবে। কোথায় যেতে হবে তা জানি না। তবে বসে থাকতে পারছি না। কোথায় যাব! কোথায় যাব করে হঠাৎ মনে পড়ল নুরুর কথা। নুরু আমার সহপাঠি। ছাত্র ভাল ছিলনা বলে স্কুলে থাকতেই চলে গেল বেঙ্গল রেজিমেন্টে। সে এখন ছুটিতে। আমাদের পাশের গ্রামে তার বাড়ী। কিন্তু আড্ডা হয় আমাদের গ্রামে।
গ্রামের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। ভাইপো ফজলুকে পেলাম।(পরে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে ডালিমের সাথে ছিল)। আমি খবর দেবার আগেই সে বলল, চাচা, সব শেষ। কত লোক যে মারা গেছে কে জানে। আমাদের আত্নীয়স্বজন যারা থাকে তাদের খবর জানার জন্য কান্নাকাটি শুরু হয়েছে। তুমি আগেই চলে এসেছ ভাল করেছ। কথা বলতে বলতে আমরা চলে গেলাম স্কুলের মাঠে। ওখানেই আমাদের আড্ডা বসে। দেখতে দেখতে আরও অনেকেই এসে যোগ দিল। সবাই জেনে গেছে ঢাকার খবর। আলোচনা সমালোচনা চলল। বললাম, চল নুরুর কাছে যাই। দেখি সে কি বলে। দশ মিনিট হেটে নুরুর বাড়ীতে গেলাম। সে চলে গেছে চন্ডিদ্বার বাজারে। এই অবস্থায় আমাদের করনীয় কি হবে তা নিয়ে আলোচনা হল। আপাতত আমরা বাঁশ দিয়ে তীর ধনুক তৈরি করব। হাজি চাচা এই কাজে পারদর্শি। তাকে সবাই গিয়ে বললাম। তিনি রাজি হয়ে বাঁশ দিয়ে শুরু করলেন তীর ধনুক তৈরি। তীর ধনুক তৈরি হচ্ছে, আমরা তীর ধনুকের সৈনিকরা আলোচনা করছি কিভাবে এসব ব্যবহার করা হবে। এক সময় নুরু এসে হাজির। আমাদের কান্ড দেখে সে হাসল। বলল, তীর ধনুক দিয়ে কি করবি? অস্ত্রের মুখে এসব কিছুই না। তোদের কোন ধারনা নাই অস্ত্র কি কিনিষ, কত ভয়াবহ। বাদ দে এসব অদ্ভুদ চিন্তা। এখন অপেক্ষা করতে হবে অবস্থা কোনদিক যাচ্ছে। ইপিআর ক্যাম্পটা কিভাবে দখল করা যায় সেই চিন্তা কর। গ্রামের মানুষের সাথে বসে এ ব্যাপারে কথা বলা দরকার। আমাদের এখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই।
গ্রামে রাতের খাবার তাড়াতাড়িই হয়ে যায়। আটটার দিকে খাওয়া শেষ হতেই লবখা গ্রামের দুলাভাই এসে উপস্থিত। তিনি চাকরি করেন বেঙ্গল রেজিমেন্টে। দু সপ্তাহ হল ছুটিতে এসেছেন। ঢাকার খবর শুনে তিনি প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন। বললেন, নমুনা ভাল ঠেকছে না। একটা কিছু হবে। আমার মনে হয় আগরতলা গেলে আমরা একটা সব জানতে পারব। তাই আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি। চল কাল আগরতলা থেকে ঘুরে আসি।
বললাম, চলুন যাই। এর মাঝে হয়ত আরও কিছু খবর পাওয়া যাবে। অনেক আলোচনা, সমালোচনা করে অনেক রাতে ঘুমাতে গেলাম।

২৮ তারিখ সকালে ঘুম ভাংগল মায়ের ডাকে। নাস্তা ঠান্ডা হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে আস। তাগাদা দিয়ে চলে গেলেন। আমরা দুজন প্রস্তুত হয়ে উঠানে এলাম। দেখি ছোট একটা টেবিলে নাস্তা রেডি। আমরা দুজন খাওয়া শুরু করলাম। রিয়াজ রেডিওটা এনে টেবিলে রেখে চলে গেল।
আমি খাচ্ছি আর রেডিওর নব ঘুরাচ্ছি। দেখি নতুন কিছু কোথাও পাওয়া যায় কিনা। ঘুরাচ্ছি আর কান পেতে আছি। হঠাৎ একটা ক্ষিন আওয়াজ ভেসে এল, 'এন এ্যাপীল টু দা ওয়ার্ল্ড.. .. ". রেডিওটা কানের কাছে নিলাম। এবার স্পষ্ট শুনতে পেলাম, এ্যান এ্যপীল টু দা ওয়ার্ল্ড, উই আর এট ওয়ার, পিজ হেলপ আস, দিস ইজ মেজর জিয়া, অন বিহাফ অব শেখ মজিবুর রহমান, পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ। " সাথে সাথে বাংলায় বলছে, আমি মেজর জিয়া বলছি, বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে.. .." । খাওয়া বন্ধ করে দুলাভাই কান পেতে আছেন। আমি আনন্দে নেচে উঠলাম। পেয়ে গেছি দুলাভাই। শুরু হয়ে গেছে! এইযে ভাল করে শুনুন। এই স্টেশনটা কোথায়! স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র! যাক শুরু হয়ে গেছে তাহলে! কে এই মেজর জিয়া! কোনদিন নাম শুনিনি তো! আপনি নিশ্চয়ই জানেন?
না, আমিও শুনিনি। তবে নামে কি আসে যায়! যুদ্ব শুরু হয়েছে এই বড় কথা। আমি অনুমান করেছিলাম একটা বড় কিছু ঘটতে যাচ্ছে। বলে দুলাভাই বললেন প্রস্তুত হয়ে যাও।
আমি বললাম, আমি প্রস্তুত। এই জিয়া নামে মেজরকে মাথায় নিয়ে নাচতে ইচ্ছে করছে। বেটা বাঘের বাচ্চা!
দুলাভাই বললেন, চল এখনই আগরতলা রওয়ানা দেই। সেখানে গেলেই সব খবর পাওয়া যাবে।
ইন্ডিয়ার বর্ডার আমাদের বাড়ী থেকে মাইল খানেক। আগরতলা আমার বাড়ী থেকে কোনাকোনি হেটে গেলে তিন চার ঘন্টা লাগে। আর পূবদিকে সোজা গিয়ে ইন্ডিয়ার শেখেরকোট বাজার থেকে বাসে গেলে ঘন্টা দেড়েক লাগে। বাংলাদেশের যে কোন শহর থেকে আগরতলা আমাদের খুব কাছে। বৃটিশ আমলে আগরতলা ছিল এই এলাকার মানুষের প্রধান শহর। আমরা ছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যের অধিনে। আমরা ছোট বেলায় আগরতলা যেতাম সিনেমা দেখতে। জীবনের প্রথম সিনেমা দেখেছি আগরতলায়। হলটার নাম এখন মনে নেই। আমাদের অনেক বন্ধু আছে সেখানে।
আমি বললাম,চলুন। প্রয়োজন হলে রাখালদের বাড়ীতে থেকে যাব রাত। রাখাল আমাদের অনেকের বন্ধু। তাদের বাড়ী ছিল আমাদের পাশের গ্রামে নয়ামুড়া। মামা বাড়ী আর আমাদের বাড়ীর মাঝখানে। বলখেলার মাঠ থেকেই পরিচয়। একদিন হঠাৎ তারা চলে গেল আগরতলা আর তাদের বাড়ীতে এল এক মুসলমান পরিবার আগরতলা থেকে। তারপরও রাখাল মাঝে মাঝে আসে বেড়াতে। গত বছরও এসেছিল গোসাইস্থলের মেলায়।
দুলাভাই জিজ্ঞেস করলেন, যাবে কোন্ দিক দিয়ে? কোনাকোনি গেলে তো অনেক পথ, তুমি এতটুকু হাটতে পারবে? আমার শরীরের সাইজখানা তখন হাটার মত নয়। বললাম, দুলাভাই থাকতে আমি হেটে যাব কেন?
আমি তো বলছি না, জিজ্ঞেস করছি। তাহলে বাসেই চল।
আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। এমন সময় বাবা এসে বললেন, তোমরা কাল যাও। আজকে অপেক্ষা কর। নতুন কোন নির্দেশ আসে কিনা দেখ। একটা রেডিও স্টেশন যখন চালু হয়েছে তখন কোন নির্দেশ আসতে পারে। আমরাও ভাবলাম কথাটা ঠিক। আজকের দিনটা অপেক্ষা করাই ভাল।
না, সারাদিন শুধু একই খবর শুনলাম। নতুন কিছু নাই।
পরের দিন সকালে খেয়ে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি এমন সময় আমাদের গ্রামের হায়দার আলীর মেয়ে জামাই এসে উপস্থিত। সেও যাবে আমাদের সাথে। ঠিক আছে, চল। (এই জামাই স্বাধীনতার পর অস্ত্র নিয়ে বামুটিয়ার রহমানের বাড়ীতে অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকাকালে খুন হয়। খুনি রহমান সব স্বীকার করে এখন যাবৎজীবন জেলে)।

সকাল এগারটার সময় পৌছলাম আগরতলা চৌমুহনীতে। কোথায় যাব, আমাদের লোকজন কোথায় আছে, কোন খবরই জানিনা। একটা চা ষ্টলে ঢুকলাম। তিনজন তিন কাপ চা খেতে খেতে দুএকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, দাদা এখানে বাংলাদেশের লোকজন কোথায় আছে কিছু খবর জানেন কি?
একজন বলল, জয়বাংলার লোক আপনারা?
এই প্রথম শুনলাম একটা দেশের নাম হয়ে গেছে জয়বাংলা। যা ছিল একটা স্লোগান, যা বঙ্গবন্ধুর মুখেই বাঘের গর্জনে ভেসে যায় আকাশে বাতাসে। বললাম হ্যা, আমরা জয়বাংলার লোক। কার কার আত্নীয় কখন এসে পৌছেছে সে তার কিছু খবর দিল। আমি বললাম, না সেসব খবর চাচ্ছিনা। চাচ্ছি এখানে জয়বাংলার কোন অফিস করেছে কিনা। একজন বলল, অফিস করেছে কিনা জানি না, তবে কংগ্রেস ভবনে কিছু জয়বাংলার লোক দেখেছি। অফিস কিনা জানি না। আপনারা সেখানে গিয়ে খবর নিতে পারেন।
বললাম, আমরা তো সেরকম খবরই চাচ্ছি। আমরা কংগ্রেস ভবনে পৌছলাম।
পৌছেই দেখি লতিফ ভাই বসে আছেন। (আব্দুল লতিফ মিয়া, সেক্রেটারি, ইষ্টার্ন জোন, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাধীনাতার পর টি সি বি-তে কর্মরত।) তার সামনে এক ভদ্রলোক বসে কথা বলছেন। পাশের টেবিলে আর এক ভদ্রলোক টেবিলে মাথা রেখে চোখ বুঝে পড়ে আছেন। আমাকে দেখেই লতিফ ভাই বললেন, এসে গেছ! তাঁর কথাতে মনে হল আমি যে আসব তিনি জানতেন। অথচ তাঁর সাথে আমার দেখা নেই গত কয়েক বছর। সামনের ভদ্রলোকর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন, মেজর বাহার। পাশের টেবিলে যিনি ঘুমাচ্ছেন তার দিকে আঙ্গুল দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি?
ইনি আব্দুল কুদ্দুস মাখন। দুদিন ঘুম নেই। এই কতক্ষন আগে এসে পৌছেছে।
জিজ্ঞেস করলাম এখন আমাদের করণীয় কি? আমার সাথে এখন দুজন এসেছে, তারা যুদ্ধে যেতে চায়। আমাদের এলাকার আরও লোকজন আছে, তাদের কি বলব?
একটু অপেক্ষা কর। এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি আমরা কিভাবে কি করব। আজ রাতের মধ্যেই সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। যারা এসেছে তাদের নাম ধাম লিখে রাখ। আমাদের এখনও কোন খাতাপত্র নেই। তুমি রাস্তার পাশে একটা দোকান আছে সেখান থেকে একটা খাতা নিয়ে এস এবং তাদের নাম লিখে নাও।
আমি দু রুপি দিয়ে একটা খাতা কিনে আনলাম এবং নামগুলি লিখলাম। প্রথম নামটা আমার দুলাভাই আব্দুর রহমান, গ্রাম লবখা, কসবা, বাংলাদেশ। এই প্রথম খাতা যা দিয়ে শুরু হয় মুক্তিযোদ্ধার নামের একটা তালিকা। করার মত কাজ আর এমন কিছুই নেই তখন।
সন্ধ্যার দিকে বাড়ীর পথে রওয়ানা দিলাম। লতিফ ভাই জিজ্ঞেস করলেন, এখন কোথায় যাবে? থাকার জায়গা আছে?
না, এখানে থাকার জায়গা নেই। বাড়ীতেই চলে যাব।
মানে? তোমার বাড়ী কোথায়?
এই তো এখান থেকে ঘন্টা দুয়েক লাগে। একদম বর্ডারে।
তাহলে তো ভালই হল। বাড়ী থেকেই আসতে পারবে। কিন্তু কদ্দিন পারবে সেটা হল কথা।
দেখা যাক, যতদিন পারা যায় ততদিন চলবে।
লতিফ ভাইর সাথে পরিচয় ঢাকা মিটফোর্ডে থাকা কালে। আমি কিছুদিন মামার বাসায় ছিলাম। লতিফ ভাই মামার দোকানে টেলিফোন করতে আসত। সেই থেকে পরিচয়। তখন তিনি এম এ পড়েন আর পাড়ায় নেতাগিরি করেন। সে ১৯৬৫ সালের কথা। মামার সাথে ভাল সম্পর্ক ছিল বলে আমাকে খুব স্নেহ করতেন। পরে শুনেছি তিনি আওয়ামীলীগের একজন নেতা। মাঝে মাঝে দেখা হত। অনেকদিন পর আজ আবার দেখা হল।

শেখের কোটের বাজার থেকে পায়ে হেটে বাড়ী পৌছতে এক ঘন্টার বেশি সময় লাগল। বুঝতে পারলাম বাড়ী থেকে আগরতলা পৌছতে লাগবে দু ঘন্টার একটু বেশি। কাজেই লতিফ ভাইর মত হোটেলে না থাকলেও চলবে।
এখন প্রতিদিন সকালে যাই রাতে ফিরি। প্রথমত করার মত এমন কিছুই ছিল না। দুএকদিনের মধ্যেই শুরু হল জনস্রোত। নদীর স্রোতের মত মানুষ আসছে। যে যেভাবে পারে কোন রকমে বর্ডার পেরিয়ে এসে পৌছল ইন্ডিয়ার মাটিতে। যেন তারা জানত এই মহাবিপদের দিনে ইন্ডিয়ার মাটিতে পৌছতে পারলেই বেঁচে যাবে। শিশু মহিলা যুবক যুবতি বৃদ্ব বৃদ্বা মিলে নিঃস্ব হাতে আশ্রয় নিল খোলা মাঠে। ইন্ডিয়ান সরকার প্রমাদ গনল। রাতারাতি শত শত শরণার্থী শিবির তৈরি হল। এই লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর থাকা খাওয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। ইন্ডিয়ার অবস্থা তেমন নয় যে এই শরণার্থীর ব্যয়ভার বহন করে। তাই বিশ্বের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে যথেষ্ট সারা পাওয়া গেল।
এক সপ্তাহের মধ্যেই তৈরি হল হাজার হাজার শরণার্থী শিবির। ইন্ডিয়া বর্ডারের একটু ভেতরে সমস্ত বর্ডারব্যাপী লক্ষ লক্ষ শরণর্থীর মাথা গোজার ঠাঁই হল। রেশন পদ্দতি চালু হল।
লক্ষ লক্ষ মানুষের হাজার হাজার শরণর্থী শিবিরে কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হল রোগের প্রাদুর্ভাব। ডায়রিয়া, গুটি বসন্ত ইত্যাদি রোগে অনেকেই আক্রান্ত হতে লাগল। কিন্তু পরিমানে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে যে যেভাবে পারে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে।
মুক্তিবাহিনিতে যারা যোগ দিচ্ছে আগরতলা থেকে তাদের পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে মেলাঘর বা অন্যান্য ট্রেনিং সেন্টারে। চলল যুদ্বের প্রশিক্ষন। ভাইপো ফজলু চলে গেল করিমগঞ্জ। আমার অনুজ রিয়াজ তখন তের বছরের বালক। সে গেল ভর্তি হতে। আমি তাকে ধমক দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম। এত ছোট বাচ্চা যুদ্বে যাবে কি করে। সেদিন সে বাড়ী গেল ঠিকই। কিন্তু পরের দিন সে চলে গেল নুরুর কাছে। যুদ্ব শুরু হবার সাথে নুরু যোগ দিল মুক্তি বাহিনীতে এবং মেলাঘরে ইন্ডিয়ান আর্মির সাথে কর্মরত ছিল। রিয়াজ নুরুর কাছে গিয়ে বলল, ভাইয়া আমাকে পাঠিয়েছে আপনার কাছে। আমি যুদ্বে যাব সে ব্যবস্থা করতে বলেছে। নুরু বলল, তোমাকে নেয়া যাবে না। এত ছোট বাচ্চা নেবার চিন্তা এখনও করিনি। এখনও যথেষ্ট পরিমানে উপযুক্ত লোক যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত। সেগুলো শেষ হলে এবং উপযুক্ত না পাওয়া গেলে তোমাকে নেবার চিন্তা করা যাবে। অনেক আকুতি মিনতির পর নুরু রাজী হল। তবে সে রিয়াজকে খুব আগলে রেখেও শেষ রক্ষা হলনা। কসবার মন্দবাগে জুলাইর শেষে এক সম্মুখ যুদ্ধে তার হাতে গুলি লেগে গেল। তাকে নিয়ে এল আগরতলায়। ছুটে গেলাম দেখতে। ডাক্তার বলল, ভয়ের কিছু নেই। গুলি হাতের এফুরওফুর হয়ে চলে গেছে। ঘা সারতে যে কয়দিন লাগে। এক মাস পর রিয়াজ আবার ফিরে গেল তার জায়গায় নুরুর সাথে। নুরু পরে হয়ে গেল গোসাই। দু নম্বর সেক্টরে নুরু বলতেই বুঝাত গোসাই। অনেক দিন চুল দাড়ি কাটেনি। তার চেহারা রাজপুত্রের মত। অনেক সময় কোন কোন মানুষকে লম্বা চুল দাড়ি খুব মানায়। তার চুল দাড়ি দেখে হিন্দুরা মনে করত সে গোসাই। গ্রামে বা বাজারের পথে যেতে অনেক সময় হিন্দুরা তাকে প্রণাম করত। তার অনেক বীরত্বের কাহিনী আছে। সে সব কাহিনী পরে মানুষ ভুলে গেছে। এখন ভুলে গেছে নুরুকেও।
মে মাস পর্যন্ত আমাদের এলাকা ছিল স্বাধীন। জলাদবাহিনী এবং রাজাকারমুক্ত। কসবা থেকে আখাউরা পর্যন্ত এবং সি এন্ড বি রোড থেকে ইন্ডিয়ার বর্ডার পর্যন্ত এই বিশাল এলাকা ছিল স্বাধীন। মানুষ মনে করত এখানে জলাদবাহিনী আসবে না। তারপরও সবাই প্রস্তুত ছিল কখন কি হয়। মে মাসের শেষের দিকে হঠাৎ একদিন গভীর রাতে আক্রমন হল এই স্বাধীন এলাকা। নির্বিচারে হত্যা করল যাকে পেয়েছে তাকেই। কত মানুষ মারা গিয়েছিল আজ সব মনে নেই। কিন্তু আপন যারা মারা গেল তাদের কথা ভুলিনি। রাজনগরের রশিদ ভাই, গানপুরের জমাদ্দার, হানিফ, বাড়াইর আলফাজ, চন্ডিদ্বারের শেখর, লতুয়ামুরার কুদ্দুস আরও অনেকে। যারা বেচে রইল তারা কোন রকমে গিয়ে পৌছল বর্ডার পেরিয়ে

ইন্ডিয়ার মাটিতে। এদের অনেকেই শিরিরের কথা শুনেছে। সেখানে রোগ ব্যাধি তো আছেই, তার চেয়ে ভাবনার কথা হল পর্দা পুষিদা রক্ষা হয় না। তাই এই মানুষগুলো নিজেরাই বাঁশ ছন দিয়ে নিজেদের মত করে ঘর তৈরি করে নিল। তখন ভারতের মানুষগুলোও যেন বদলে গেল। কার বাঁশ কে নিচ্ছে, কার ছন কোথায় যাচ্ছে কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করছে না। এ যেন সকলের এজমালি সম্পত্তি। যার যত লাগে নিচ্ছে। শিবিরে একটা নিয়ম কানুনের ভিতর চলতে হয়, এখানে তারা সেদিক থেকে মুক্ত। শেষ পুর্যন্ত দেখা গেল এই পাহাড় জঙ্গল মানুষে গিজ গিজ করছে।
আমার পরিবার আশ্রয় নিল বরচতলের পুবদিকে। একটি ছোট টিলার উপর আরও কয়েকটা পরিবার মিলে নিজেরা তৈরি করল তাদের যার যার কুড়েঘর।
এখন আগরতলার পথ দেড় মাইল কমে গেল। সময় কম লাগে। তারপরও আগরতলায় থাকার ব্যবস্থা করিনি মায়ের কারনে। মা ভয় পেয়ে গেছেন। জলাদরা নির্বিচারে যেভাবে গুলাগুলি ছুড়েছে, মানুষ যেভাবে মারা গেছে তা দেখে এবং শুনে তিনি মনে করেন এ রকম ঘটনা আরও হতে পারে। তাই তিনি তার আদরের ধনকে অন্যত্র যেতে দিতে চান না।
গোপিনাথপুরের লোদন ভাই শিবিত্মে আশ্রয় নিয়েছে। আগরতলার চৌমুহনীতে দেখা। তিনি বললেন, একটা কিছু করতে হবে। কিন্তু কোথায় কি করবেন কার কাছে যেতে হবে কিছুই জানে না। বললাম চলুন আমার সাথে। লতিফ ভাইকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম, তিনি কিছু করতে চান। লতিফ ভাই বললেন, আমি একটু ভেবে নিই। কাল একবার আসুন। দেখি কি দেয়া যায়। পরের দিন বললেন, হাপানিয়া ইয়থ ক্যাম্পে আপাতত একটা কাজ আছে। সপ্তাহে তিন দিন। জিজ্ঞেস করলাম কাজটা কি? তিনি বললেন পলিটিকেল মোটিভেটর। ছেলেদেরকে মোটিভেট করতে হবে। লোদন ভাই পলিটিকেল মোটিভেটর হিসেবে কাজ করলেন জুলাই পর্যন্ত। তারপর এলেন অফিসে।
আগষ্টের মাঝামাঝি একদিন অফিসের সামনে অনেক লোকের ভীড়। কোলাহল শুনে বাইরে তাকিয়ে দেখি একটা ট্রাক দাড়িয়ে আছে। সেখান থেকে নুরু নামছে, তারপর এক এক করে তিনজন পাকিস্তানি আর্মি নামছে। নুরুর সাথে রিয়াজ এবং আরও দুজন মুক্তিযোদ্ধা। আমি কাছে গিয়ে দেখি একজন আর্মির একটা হাত ডানা থেকে নেই। তার শরীরের অর্ধেকটা রক্তে লাল হয়ে আছে। কোথাও শুকিয়ে গেছে। এ পর্যন্ত দেখার পরই আমার অবস্থা কাহিল। প্রায় মাথাঘুরে পরে যাবার অবস্থা। একটা মানুষের হাত নেই! সে এখনও বেঁচে আছে! একজন মানুষের হাত আর একজন কিভাবে উড়িয়ে দিতে পারে! পাঠক ক্ষমা করবেন, আমি কত ভীরু, আমি অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে যাব! অস্ত্র হাতে নিয়েই কাপতে কাপতে পড়ে যাব। আমি কোন মানুষকে হত্যা বা জখম করতে পারব না। সে শত্রুই হোক আর খুনিই হোক। যাই হোক, খুব শক্তি সঞ্চয় করে দাড়ালাম এবং নুরুর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলাম কোথা থেকে ধরলি?
শালদানদীর ব্যাংকার থেকে। দুই ঘন্টা গোলাগুলির পর শালাদের গুলি শেষ। যখন দেখলাম আর গুলির শব্দ আসছেনা তখন বুঝলাম তাদের গুলি শেষ। তারপর কাছে গিয়ে গ্রেনেড চার্জ করলাম। গ্রেনেডে তার একটা হাত চলে গেছে। সে এই গ্রুপের কমান্ডার। হাত না গেলে ধরা খুব শক্ত হত। এখানে নিয়ে এসেছি মানুষ দেখুক। দেখলে মানুষের মনে আস্থা বাড়বে। এখনই নিয়ে যাব ইন্ডিয়ান আর্মির অফিস মেলাঘর। যুদ্ধ বন্দি হিসাবে তাদের জমা দিব।
এক কাপ চা আনল কে যেন। চা খেতে খেতে নুরু যার হাত নেই তাকে জিজ্ঞেস করল, এই খানের বাচ্চা, তোকে এখন ছেড়ে দিলে কি করবি?
সে সাথে সাথে উত্তর দিল, লেড়েগা।
নুরু বলল, তোর লেড়েগা বার করি। উঠ, বন্দিদের ট্রাকের পেছনে উঠতে বলল। একে একে সবাই উঠল। দাড়িয়ে রইল যার হাত নেই সে। নুরু জিজ্ঞেস করল, কি হল, উঠছনা কেন?
সে বলল, ম্যায় সিপাহী নিহি হো। পিছে নেহি বইঠেগা।

আরে শালা! এখনও তোর পদমর্যাদা! তোকে মারব না এখন। তুই তো মরেই আছিস, আয় সামনে আয় বলে সামনের একজনকে বলল পেছনে চলে যেতে।
সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে একদিন অফিসের সামনে চেচামেচি হৈ চৈ শুনে বাইরে এসে দেখি নুরু বলছে, তোকে আমি গুলি করি নাই। করলে তোকে কে বাচাবে বেটা চোর কোথাকার। যাকে এ কথাগুলো বলছে তিনি আমাদের ব্রাক্ষনবাড়ীয়ার এম পি আজদু মিয়া। তিনি হাপানিয়া ইয়থ ক্যাম্পের ইন-চার্জ। ইয়থদের থাকা খাওয়ার তদারকি করা তার কাজ। তাকে কেন সে নিয়ে এল বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে রে নুরু?
আরে দেখ, পুলাপানগুলি না খেয়ে কয়েকদিন থেকে চলে যায়। সরকারি টাকা আসে তাদের খাবার জন্য আর সে টাকা সে চুরি করে। গিয়ে দেখ এখন ক্যাম্পে অর্ধেক পুলাপান নাই। তার বিচার করার জন্য নিয়ে এসেছি। কি করবি কর।
দেখলাম আজদু মিয়ার সাথে তার বেশ কিছু চেলাও আছে। তারাও কিসব বলছে। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে জহুর ভাইকে বললাম। জহুর ভাই নুরুকে খুব ভালবাসে। তার বীরত্বের কথা তিনি সব সময় বলেন। শুনে তিনি বললেন, পাগলাটা তাহলে একটা ঝামেলা বাধাল! আমি তো জানি সেখানে কি হচ্ছে। ইয়থ ক্যাম্পের বিলগুলি যখন সই করি তখন দেখি সে কতগুলো ইয়থের বিল জমা দেয়। আসলে সেগুলো কাল্পনিক। তবুও সই করতে হয়। এখন তো আমাদের বিচারের সময় নয়। ডাক পাগলটাকে।
নুরু এলে তিনি বললেন, তুই এটা কি করেছিস? নিজেদের মাঝে একটা মারামারি লাগিয়ে দিতে চাস? সে কি করে আমি সব জানি। যারা এসব করে তারা নিজেদের একটা দল হাতে রেখেই করে। তার নিজেরও বেশ কিছু লোক আছে। তার বিচার করতে গেলে দেখবি তার সমর্থকরা অন্যায়ভাবে তার পক্ষ নিবে। নিজেদের মাঝে একটা মারামারি হবে। এখন বিচারের সময় নয়। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য সফল করতে হবে, তারপর বিচার। জয় করেই বিষ ক্ষয় করতে হবে। যা, তাকে নিয়ে আর কোন কথা বলবি না। আগে যুদ্ধ জয় কর, তারপর সব বিচার হবে। নুরু সুবোধ ছেলের মত বেরিয়ে গেল। দরজার বাইরে গিয়ে আজদু মিয়াকে বলল, আজ তোরে ছেড়ে দিলাম শুধু দেশের স্বার্থে। তবে আমি তোকে ছাড়ব না। বলে সে চলে গেল। লোদন ভাই তখন জহুর ভাইকে জিজ্ঞেস করল, জহুর ভাই, আমরা এখন দুর্নীতির কোন্ পর্যায়ে আছি?
জহুর ভাই বললেন, আগে তো আমাদের আঙ্গুলটা দেখা যেত, এখন আঙ্গুলটাও ডুবে গেছে।
নুরু চলে গেলে আজদু মিয়া তার চেলাদের উদ্দেশ্যে ছোটখাটো একটা বক্তব্য রাখল এবং বলল, দেখলে তো তোমরা। সে ভুল বুঝে ভুল করে আমার সাথে এই ব্যবহারটা করল। যাও, তোমরা যার যার কাজে যাও।
ইয়থ ক্যাম্পের শুরুতেই আজদু মিয়া এই ক্যাম্পের ইনচার্জ। আমরা কেউ কোনদিন খেয়াল করিনি বা আমাদের খেয়াল করারও কথা নয়, সেখানে কি হচ্ছে। ইয়থ ক্যাম্পে যারা যুদ্ধে যাবে, এখনও ব্যবস্থা হয়নি তারাই ইয়থ ক্যাম্পে থাকে। তাদের থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থা করার জন্য আজদু মিয়া আছে। টাকা আসে ইন্ডিয়ান সরকারের কাছ থেকে। মাথাপিছু একটা নির্দিষ্ট অংক দেয়া হয় যা দিয়ে একজন মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করা যায়। বাংলাদেশ সরকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরির অনুমোদন নিয়ে এইসব বিল প্রদান করা হয়।
হাপানিয়া ইয়থ ক্যাম্পের বিল কবে থেকে কি হচ্ছিল তা আমাদের জানার কথা নয়। কিন্তু জহুর ভাই সব জানেন। শুরুতে প্রায় তিন হাজার ইয়থ ছিল ক্যাম্পে। প্রয়োজনীয় খাবার না পেয়ে ছেলেরা চলে গেছে যার যার পথে। কেউ গেছে শরণার্থী শিবিরে, কেউ গেছে নিজেদের পরিবার বা আত্নীয়স্বজনের কাছে। দেখা গেছে কোন কোন সময় ইয়থের সংখ্যা কয়েক শ’ তে চলে এসেছে। ইয়থ কমে যাবার অনুপাতে খরচও সেই অনুপাতে থাকা উচিত। কিন্তু আজদু মিয়ার বিল আর কম হয় না। বরং মাঝে মাঝে বেশি

দেখানো হয়। লোদন ভাই যখন সেখানে যেতেন তখনও দেখতেন কয়েক শ ছেলে আছে। কিন্তু আজদু মিয়ার বিল তিন হাজার বা তার বেশি। এভাবে সে প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব করেছে।

সেই সময় বেশিরভাগ নেতারা হোটেলে থাকতেন না। তারা তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে বাড়ী ভাড়া করে থাকতেন অনেক শান শৌকতে। তাদের কোন কিছুর অভাব ছিল না। দেশ যদি আরও পঞ্চাশ বছরেও স্বাধীন না হয় তাতে তাদের চিন্তার কোন কারন নেই। অনেকে এমন কামনাও করত। এখানে তারা মন্ত্রির চেয়েও বেশি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। দেশ স্বাধীন হলে তারা হয়ত বাংলাদেশে এমন সুযোগ নাও পেতে পারে। তাই তারা এখানে যে যেভাবে পারে পয়সা বানিয়ে নিচ্ছে। স্বাধীনতা তাদের কাছে গৌণ। তাদের খাওয়া দাওয়া বাজার সদাই চালচলন দেখলে মনে করার কোন উপায় ছিলনা তারা ভিন দেশে শরণার্থী, স্বল্পকালের জন্য। তারা রিলিফ খাচ্ছে, রিলিফের টাকা মারছে, যার রেশ স্বাধীনতার পর বাংলাদেশেও চালু হল। এখনও চলছে। চলবে।

অক্টোবরের একদিন বাসাবোর আলাউদ্দিন (যার নামে এখন বাসাবো কলেজ) তার তিন সঙ্গি নিয়ে অফিসে এল। সে এতদিন কোথায় কোথায় ছিল তার একটা ফিরিস্তি দিয়ে বলল, সে চলে যাবে বাংলাদেশে এবং তার নিজের বাড়ী বাসাবোতে। সে বাসাবো আওয়ামীলীগের সেক্রেটারি। দশ বছর যাবত বিএ পরিক্ষা দিচ্ছে। লেখা পড়া বাদ দিয়ে সমাজ সেবায় নিয়োজিত থাকে। যে কোন কাজে যে কেউ ডাক দিলে সে হাজির। আলাউদ্দিনকে চিনে না বাসাবোতে এমন মানুষ নেই। বিশেষ করে বাসাবোর রিফিউজি কলোনির বিহারিরা। তার কথাবার্তায় মনে হল সে হতাশ হয়ে গেছে। এখানে তাকে কেউ কোন দাম দিচ্ছে না। সে চায় সব সময় ব্যস্ত থাকতে। কিন্তু তা পারছে না। আর এখানকার কাজকর্ম দেখে সে স্থির করেছে ফিরে যাবে বাড়ীতে।

তাকে অনেক বুঝাতে চেষ্টা করলাম। বললাম, এ সময় তুই বাড়ীতে গেলে বাসাবোর সব বিহারিরা তোকে ছাড়বে না। ওরা এখন সবাই রাজাকার। তোকে ভাল করে চিনে। তোর কষ্ট হচ্ছে জানি, সবাই তো এখানে কষ্ট করছে। সে তখন রেগে উঠল। বলল, কোথায় কষ্ট করছে? ওরা তো সবাই খুব ভাল আছে। কই নেতারা তো কোন কষ্ট করছে না! তাদের ছেলে মেয়েরা কেউ তো যুদ্ধে যায়নি! দেখলে মনে হয় তারা এখানে আরাম করতেই এসেছে। যুদ্ধ করছে অশিক্ষিত মানুষ। দেশপ্রেমিক যারা তারাই যুদ্ধ করছে, মরছে। আমাদের কোন নেতা বা তার সন্তান কেউ তো কোথায়ও আহত হতে শুনিনি। এসব দেখলে আমার সহ্য হয় না। আমার শরীরটা যদি যুদ্ধে যাবার উপযুক্ত হত তাহলে আমি সবার আগে অস্ত্র নিতাম। বলা বাহুল, আলাউদ্দিন এত মোটা যে সে নড়াচড়া করতে পারে না।

কোন যুক্তিই সে মানল না। চলে গেল বাংলাদেশে।

দেশে গিয়ে কোথায় কোথায় ছিল তা কিছুই জানি না। স্বাধীনতার পর মানুষের কাছে শুনলাম ১৪ই ডিসেম্বরে আলাউদ্দিনকে ধরে নিয়ে যায় রিফিউজি কলোনির রাজাকারেরা। বাসাবো এবং মাদারটেকের রাস্তায় তার দেহটা পড়েছিল দুদিন। তার চোখ দুটি তোলে নিয়ে গেছে। হাত পা ভাঙ্গা, দেহে কোন কাপড় ছিল না। কেউ কেউ বলে দুদিন পর্যন্ত সে জীবিত ছিল। ভয়ে কেউ তার কোন সাহায্য করেনি। এখন তার নামে বাসাবো কলেজ হয়েছে।

অনেক প্রতিক্ষার পর সেই দিনটি এল। ১৬ই ডিসেম্বর। নিয়াজি আত্নসমর্পন করেছে। নিয়াজির আত্নসমর্পনের পেছনে যার বেশি দান তার কথা এখন আর কেউ বলে না। সেই বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী এখন অবহেলিত। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর দান অপরিসীম। বঙ্গবন্ধু সপরিবারে হত্যার পর একমাত্র কাদের সিদ্দিকীই প্রতিবাদ করেছিলেন। আর কেউ নয়। তাঁর অবদানের কথা বিশদভাবে লিখেছেন ডাঃ নুরুন নবী তার বই "স্বাধীনতা আমি দেখেছি"।

নিয়াজি আত্নসমর্পন করেছে। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। এবার ফিরে যাবার পালা। আকাশে বাতাসে আনন্দের ঢেউ। মানুষ তাদের নিজগৃহে ফিরে যাবে, কর্মজীবিরা তাদের কাজে, আর নেতারা ফিরে যাবেন

নেতাগিরি করতে। ক্ষমতা ভাগভাগি করতে। কার আগে কে যাবেন সেই প্রতিযোগিতা। ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলো খুব ব্যস্ত, ছেড়ে দেবার কাজে। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ফিরে যাচ্ছে নিজের ঠিকানায়।

১৭ই ডিসেম্বর সকালে ভাবছি কি করব। লোদন ভাই বলল, চল অফিসে একবার যাই। আমাদের কোন আদেশ দেয়া হয় নাই এখন কি করব। অফিসে গেলে হয়ত তা কিছু একটা জানা যাবে। তাহলে চলুন, দেখি এখন আমাদের উপর কি আদেশ হয়।

সকাল এগারটার দিকে অফিসে পৌছলাম। দেখি কেউ নেই। এখন কি করব! দুজনে একটা চায়ের দোকানে গিয়ে চায়ের অর্ডার দিলাম। আরও দুএকজন ছিল সেখানে। বাংলাদেশের কয়েকজন। একজন বলল, আজ সকালেই সব নেতারা চলে গেছে ঢাকায়। হেলিকপ্টারে। আপনারা চলে যাননা কেন?

তাইত! আমরা বোকার মত এখানে এসেছি কেন? লোদন ভাই, আমাদের এখানে আসা উচিত হয় নাই। এখন যে আগে ঢাকা যাবে সেই ক্ষমতার ভাগ পাবে। আমরা কিছুই না।

লোদন ভাই বললেন, আমাদের অবস্থাটা এমন হয়েছে যে, আমি কার খালুরে? আমরা এখন কোথায় তা তো নিজেরাই জানি না। চল ফিরে যাই।

রাস্তাঘাটে মানুষের কাফেলা। যার যা কিছু আছে তা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। একদিন এমনি ভাবে এসে আশ্রয় নিয়েছিল বর্ডার পেরিয়ে ভারতের মাটিতে। এখন ফিরে যাচ্ছে নিজেদের মাটিতে, স্বাধীন দেশে।

আমরা ফিরে এলাম যার যার বাড়ীতে। সেখান থেকেই নেতাদের সাথে শুরু হল মুক্তিযোদ্ধাদের দূরত্ব।

চারদিকে ধ্বংসের চিহ্ন। সবকিছু বিধ্বস্থ। মানুষ তাদের ঘরবাড়ী গুছিয়ে নিচ্ছে। শরণার্থী শিবিরে খাবার মিলত, এখানে এই ধ্বংসের মাঝে কি মিলবে কেউ জানে না। তারপরও মানুষ খুশি। তারা নিজেদের ঘরে ফিরেছে।

পরের দিন ১৭ই ডিসেম্বর আমি আর লোদন ভাই রওয়ানা দিলাম ঢাকার পথে। কিভাবে যাব তা কিছুই জানি না। তিনলাখপীরের মোড়ে সি এন্ড বি সড়কের পুলের কাছে এসে দাড়ালাম। যুদ্ধের নয়মাস ব্রাহ্মনবাড়িয়া থেকে কোম্পানীগঞ্জ পর্যন্ত একমাত্র পথ ছিল এই তিনলাখপীড়ের পুল যার নীচে দিয়ে মুক্তিবাহিনী বা সাধারান মানুষ পাড়াপাড় হত। দেখি দুএকটা বাস চলে। কিন্তু মানুষের এমন ভীড় উপরে নীচে সমান। কলার গাধির মত দরজায় ঝুলে আছে মানুষ। কয়েকটা বাস চলে গেল। আমরা সাহস করতে পারলাম না। ঘন্টাখানেক চলে গেল। ভাবছি কি করব। লোদন ভাই বললেন, মনে হয় এভাবে উঠতে পারব না। তাহলে কি করবেন?

অন্য কিছু চিন্তা করতে হবে।

কি রকম?

বাসের ড্রাইভারকে বলতে হবে আমাদের উঠার ব্যবস্থা করার জন্য। আমরা আমাদের পরিচয় দিতে হবে। কারন আমাদের হাতে তো অস্ত্র নেই।

খুব ভাল চিন্তা। চলুন তাই করি। পরের বাস আসুক।

পরের বাসে ড্রাইভারকে বলতে হল না। বাসের ভিতর থেকে একজন চিৎকার করে বলছে, এই ড্রাইভার বাস রাখ। এই কন্ডাক্টার! নামাও এসব সামনের লোকগুলো। দুটা সিট খালি কর। ওনাদের বসার ব্যবস্থা কর। ডাক দিল, বাহার ভাই, উঠে আসুন। কে ডাকল ভীড়ের মাঝে মুখ দেখা যাচ্ছে না। দেখলাম উঠার পথ হয়েছে। ভেতরে যেতেই জাকির জিজ্ঞেস করল, কতক্ষন দাড়িয়ে আছেন? অবস্থা যা দুদিন দাড়িয়ে থাকলেও আপনারা বাসে উঠতে পারবেন না। বসুন। ঢাকা যাবেন তো? তাহলে ভৈরব পর্যন্ত বাসে যাবেন। তারপর ট্রেন। বাসও যাবে ভৈরব থেকে ট্রেনে গেলে সময় কম লাগবে। দেখলাম তার সাথে আরও দুজন সহযোদ্ধা।

জাকিরের হাতে একটা এলএমজি। এটাই যেন কথা বলছে। সে যা বলছে তাই হচ্ছে। জাকির লতিফ ভাইর দূরসম্পর্কের আত্মীয়। শুরুতে কয়েকদিন সে অফিসেই ছিল। টুকটাক কাজ করেছে। পরে চলে যায় ট্রেনিংএ। তারপর আর দেখা নেই।
জিজ্ঞেস করলাম এতদিন তোমাকে দেখিনাই। কোথায় যুদ্ধ করেছ?
আমরা তো ভিতরে থেকেই যুদ্ধ করেছি। আমার এলাকা ছিল কুটি বাজার থেকে কোম্পানীগঞ্জ। ট্রেনিংশেষে কিছুদিন ছিলাম ইয়াকুবের গ্রুপে। তারপর চলে আসি ভিতরে।
সামনের পুলটা ভাঙ্গা। সবাইকে নামতে হবে। দেখলাম ভাঙ্গা পুলের ইট সুড়কি দিয়ে রাস্তা হয়েছে কোন রকমে একটা গাড়ি যেতে পারে এমনভাবে। সেতু ভেঙ্গেছে আমাদের মুক্তিবাহিনী। জলাদ বাহিনীর চলাচলে বাধা দেবার জন্য। পাক বাহিনীর চলাচলের জন্য তারা নিজেরাই এই রাস্তা জোড়াতালি দিয়েছে। এখন আমরা ব্যবহার করছি নিজেদের প্রয়োজনে। আমাদের প্রয়োজনে আমরা ভেঙ্গেছি, এখন আমাদের প্রয়োজনে আমরাই গড়ব। এসব ভাঙ্গা পুলের পুলছেরাত পাড়ি দিয়ে পৌছলাম সবচেয়ে বড় সেতু ভৈরবের সেতু।
এই সেতুটা জোড়াতালি দিয়ে গাড়ী পারাপারের ব্যবস্থ করা যায়নি। নদীর এপার থেকে ওপার বহুদূর। খরস্রোতা। তাই এখানে ফেরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই তো দুদিন আগেও ছিল এই ফেরি জল-াদবাহিনীর দখলে, আজ সাধারন মানুষের হাতে। বাস, ট্রাক, কিছু গাড়ী লাইন ধরে আছে। সবাই ঢাকা যাবে। ফেরির ধারনক্ষমতা সীমিত। সেই লাইনে দাড়িয়ে বেলা তিনটার দিকে আমাদের বাস পৌছল ভৈরব রেল ষ্টেশনের কাছে। বাসের কন্ডাক্টর আমাদের কাছে ভাড়ার জন্য আসেনি। জাকির বলল, ভাড়া লাগবে না। আমি কন্ডাক্টরকে বলেছি। এখন ঠিক করুন বাসে যাবেন নাকি রেলে যাবেন। আমরা এখানে নেমে যাব। কিছু কাজ আছে। তারপর কখন যাব ঠিক নেই।
বললাম, ট্রেনেই যাব। অন্তত মানুষের ধাক্কাধাক্কি কম হবে।
ঠিক আছে, সেভাবেই যান। আবার দেখা হবে বলে ওরা চলে গেল।
আমরা দুজনে ভৈরব পাটফরমে ঢুকলাম। দেখি টিকেট কাউন্টার খোলা আছে। তবে কোন মানুষ নেই। আমরা অনেকক্ষন পায়চারি করলাম। গাড়ী আসার কোন লক্ষন নেই। ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরের দিকে গেলাম। তিনি আছেন। লোদন ভাই জিজ্ঞেস করল, ট্রেন কখন আসবে বলতে পারেন?
তিনি মুখ না তোলেই বললেন এর সঠিক উত্তর আমি দিতে পারব না। ট্রেন শুধু ভৈরব-ঢাকা আসাযাওয়া করে। কখন আসবে ঠিক বলতে পারব না। তবে কালিগঞ্জ আসলেই আমরা খবর পাই এবং টিকেট দেয়া শুরু করি।
শেষ পর্যন্ত ট্রেন এল সাতটায়। অনেক ভীড়। তারপরও উঠতে খুব অসুবিধা হল না। যাক একটু আরামেই যাওয়া যাবে। ঘোড়াশাল গাড়ী থামার পর দেখি অন্য রকম দৃশ্য। মানুষ আর মানুষ। এত মানুষ কোথায় উঠবে! হৈ চৈ কম্ম ট্রেনের উপরে নীচে মিলে জায়গা হয়ে গেল। মানুষ গিজ গিজ করছে। শ্বাস ফেলতে পারছিনা।
কালিগঞ্জ ট্রেন থামার সাথে সাথে বস্তা উঠতে লাগল, জানালা দিয়ে। কার উপর পড়ছে তা দেখার দায়ীত্ব যে ফেলছে তার নয়। যে ট্রেনের ভিতর আছে গা বাচাঁনো তার নিজের দায়ীত্ব। উপরে নীচে কোথাও তিল ধারনের স্থান নেই। প্রতিটি দরজায় মানুষ ঝুলছে। ঢাকার কাছাকাছি আসতেই বার বার ট্রেন থামছে। তখন মনে পড়ল ২৩শে ডিসেম্বরের শেষ ট্রেনটার কথা।
লোদন ভাই নেমে গেল তেজগাঁ ষ্টেশনে। তিনি চাকরি করেন তেজগাঁ রাবার ইন্ডাষ্ট্রিতে। ম্যানেজার। নামার সময় বলে গেলেন কাল পরশু চলে আসিস আমার এখানে।
রাত নয়টায় এসে নামলাম কমলাপুর ষ্টেশনে। হাতে এমন কিছুই নেই। বাসাবো যেতে হলে রেল লাইন ধরে গেলে পনের বিশ মিনিট। ঠিক করলাম হেটেই যাব।

যেতে যেতে ভাবছি বন্ধুবান্ধব কে কোথায় আছে কে জানে! কে বেঁচে আছে কে মরেছে কিছুই তো জানি না।

থাকতাম মধ্য বাসাবোর 'ছাত্রনীড়' মেসে। মেস আছে কিন তাও জানি না। বাসাবোর প্রতিটি বাড়ীই আমার খুব চেনা। মেস না থাকলে যে কোন বাড়ীতে উঠে পড়ব। কিন্তু উঠতে হল না। দেখি মেস ঠিক যেমন ছিল তেমনি আছে। আমাদের কাজের ছেলেটা আমাকে দেখেই দৌড়ে এল। আজ পাঁচ বছর যাবত সে এই মেসে কাজ করে। বাজার করা থেকে রান্নাবান্না সব। তাকে দেখে আমারও মনে হল সে বুঝি আমার পরিবারের কোন আপনজন।

খবর পেয়ে সাদেক, জাহাঙ্গির, মিজান আরও অনেকে এল। জানলাম আমাদের বন্ধমহলে শুধু আলাউদ্দিন ছাড়া আর সবাই ভাল আছে।

পরের দিন অফিসে পৌছার পরই একটা ছুটাছুটি হৈ হৈ পড়ে গেল। সব সহকর্মি-বন্ধুরা ছুটে এল। বুকে নিয়ে কোলাকুলি, এক সময় বডি বিল্ডার রেজাউল তো মাথায় উঠিয়ে ফেলল। সবাই মিলে একটা ছোটখাটো আয়োজন করেছে আমাকে আপ্যায়ন করার জন্য। সেখানে বড় বড় বসও ছিলেন। তাদের অনেকেই হয়ত প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন এই ভয়ে আছেন।

আপ্যায়নশেষে শুরু হল এই নয় মাসের গল্প। অফিসের গল্প। ১৬ তারিখের পর কোন বিহারি অফিসে আসেনি। কলনিতে যারা থাকত রাতারাতি উদাও হয়ে গেছে। অফিসের কে কে মারা গেল, তার মাঝে আমাদের সকলের প্রিয় ব্যাংকের লেডি ডাক্তার পাক বাহিনীর হাতে খুন হয়েছেন। যারা মারা গেছে তারা সবাই অফিসের বাইরে পথে অথবা বাড়ীতে মারা গেছেন। ব্যাংকের লাইব্রেরিয়ান আসাফউদ্দৌলা আমার নাম শুনে আজ থেকে পলাতক। তার বাড়ীতে গিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি। বাড়ী খালি। তিনি আমার শিক্ষক। যুদ্ধের সময় এবং তার আগে তার কথাবার্তায় সবাই ক্ষেপা। আমি আসলেই তাকে ধরা হবে। কিন্তু অফিসে না আসায় কয়েকজন তার বাসায় গিয়ে ধরতে পারেনি।

রেজাউল বলল, আমার কাছে একটা লিষ্ট আছে। তাতে তুই প্রথম হয়েছিস।

কিসের লিষ্ট? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ইউনিয়নের সভাপতি লতিফ বলল, মানুষ মারার লিষ্ট। গভর্নরের পিএ বিহারি ইসহাকের ড্রয়ার থেকে এই লিষ্টটা পেয়েছি। সে তো সব সময় আর্মির বড় বড় অফিসারদের সাথে যোগাযোগ রাখত। সে এই লিষ্টা তৈরি করেছিল। এতে সাত জনের নাম আছে। তার মধ্যে তোর নামটা এক নম্বরে। তোরে একবার পাইলেই হইছিল। তার অনেক ক্ষমতা ছিল। দেখিস না রাতারাতি সব বিহারিদেরকে কিভাবে সরিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেল।

তারপর আরও গল্প চলল। সেদিন অর্ধেক দিন অফিস হয়নি। সব শেষে আমি বললাম, এবার আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিধ্বস্থ দেশটাকে গড়তে হবে। কাজ করতে হবে দ্বিগুন।

-০-

দেশ শত্রুমুক্ত হয়েছে, আমরা স্বাধীন। স্বাধীনতার স্বাদ ঘরে ঘরে পৌছে দিতে হবে। আমরা গ্রহন করব। দেখা গেল স্বাধ পৌছে দিতে হয়নি। কারও কারও ঘরে পৌছে গেছে। যার তার হাতে এখন অস্ত্র। রাজধানীতে অগনিত মুক্তিযোদ্ধা। পাড়ার ছেলে যারা ঢাকার বাইরে যায়নি তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। তারাও মুক্তিযোদ্ধা। ১৬ই ডিসেম্বরে পাক বাহিনী আত্নসমর্পনের পর রাজাকার আলবদর তাদের অস্ত্র রাস্তায় ফেলে দিয়ে সাধারন মানুষের সাথে মিশে গেছে। আর এই সুযোগে যে যা পেয়েছে কুড়িয়ে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধার চেয়ে তাদের দৌরাত্ন বেশি। ১৬ই ডিসেম্বর বা তার পর যারা অস্ত্র কুড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধা দাবী করে তাদের বলা হয় ১৬ ডিভিশন। এই ১৬ ডিভিশন রাজনৈতিক নেতাদের

সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে অপরাধ করে যাচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধার নামে কলঙ্ক ছড়িয়ে দিচ্ছে। রাজনৈতিক নেতা, পাতি নেতারাও নিজেদের স্বার্থে এই ডিভিশনকে ব্যবহার করছে। যেখানে সেখানে দোকান পাট জায়গা জমি দখল করছে। সকলেই আরো সুযোগের সন্ধানে আছে।

আমার প্রথম কাজ হল আদরের ছোট ভাই রিয়াজকে মুক্তিবাহিনী থেকে এনে স্কুলে ভর্তি করা। আমার ইচ্ছা তাকে লেখাপড়া করাব। লেখাপড়া করে সে অনেক নাম করবে। রিয়াজ তখন মিরপুর মুক্তিবাহিনী কেম্পে কেপ্টেন হারুনের সাথে। **(এই কেপ্টেন হারুনুর রশিদ পরবর্তিতে লে: জেনারেল এবং সেনা প্রধান হিসেবে অবসর নেন।)** সেদিন অফিস থেকে বের হয়ে সোজা চলে গেলাম মুক্তিবাহিনী কেম্পে। কেপ্টেন হারুন আমাকে দেখেই হেসে উঠলেন। বললেন, ওকে নিতে এসেছ, কিন্তু ওর তো লেখাপড়া হবে না। আমি ওকে তোমার চেয়ে বেশি চিনি। নিয়ে লাভ নেই। বরং এখানেই থাকতে দাও।

তাঁর কথা শুনে মনে অনেকটা দু:খ পেলাম। মুখে বললাম, ও তো মাত্র তের পেরিয়েছে, লেখাপড়া হবে না কেন? আমার হাতে লেখাপড়া হবে না অমন চিন্তা আসে কি করে?

তুমি জান না, ও তোমাকে ছাড়িয়ে গেছে কোন কোন দিক দিয়ে। আর্মিতে থাকলেই সে ভাল করবে। চিন্তা করে দেখ। এখন তোমার ইচ্ছা।

আমার ইচ্ছা। নিয়ে এলাম রিয়াজকে। ভর্তি করে দিলাম বাসার কাছে খিলগাও হাই স্কুলে।

এখন দেশটা গড়তে হবে। কাজ করতে হবে দ্বিগুন। কে করবে? সবাই স্বাধীনতার স্বাদ চায়, ভাগ চায়। পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ বাঙালি ফেরত এসেছে। যে যে বিভাগে কাজ করত বাংলাদেশে এসে সেই বিভাগে যোগদান করল। তারাও স্বাধীনতার ভাগ চায়। পাকিস্তানে কাজ করে বঞ্চিত হয়েছে পদোন্নতি থেকে, সুযোগ সুবিধা থেকে। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। সবকিছু পুষিয়ে নিতে চায়। সরকারি বেসরকারি প্রায় প্রতিটি অফিসে চলছে দাবী আদায়ের অরাজকতা। মানুষের অগনিত দাবী। দাবী আদায়ের জন্য সৃষ্টি হল শত শত সংগঠন। পাকিস্তান থেকে যারা ফেরত এসেছে তাদের বলা হল রিটার্নি। রিটার্নিরা বাংলাদেশে এসে এখানকার কর্মরত কর্মচারিদের সাথে একাত্ম হতে পারেনি। কারন তাদের দাবী অযৌক্তিক। স্থানীয় কর্মচারিরা মেনে নেয়নি। কর্মচারিদের মাঝে ভাগ হল। একদল স্থানীয় আর এক দল রিটার্নী। এই রিটার্নীরা শুরু করল ঘেরাও কর্মসূচি। প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে ঘেরাও করে দাবী আদায় করা। প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই চলল এই ঘেরাও অভিযান। অযৌক্তিক দাবী আদায়। শত শত ইউনিয়নের জন্ম হল। একা দাবী আদায় করা যায় না। তাই ইউনিয়ন। ইউনিয়নের মাধ্যমে অনেক কিছু করা যায়। অফিসারস ইউনিয়ন থেকে রিক্সাওয়লা পর্যন্ত ইউনিয়ন। এমন কি যারা বাসা থেকে অফিসে লাঞ্চ নিয়ে যায় তারাও এখন ইউনিয়নের মাধ্যমে দর কষাকষি করে দাবী আদায়ে সোচ্চার। চারদিকে শুধু দাবী আর দাবী। সবাই স্বাধীনতার ভাগ পেতে চায়, স্বাদ পেতে চায়। কিছুদিনের মধ্যে এইসব দাবী জেলাভিত্তিক দাবীতে রুপান্তরিত হল। কে কোন্ জেলার লোক, সেই জেলার বড় সাহেব কে, বা কতজন। জেলা বড়সাহেবরাও নিজের জেলার মানুষকে স্বাদ পাইয়ে দিতে ব্যস্ত। কোথায় দেশটাকে গড়ে তুলবে তা না করে সবাই যার যার স্বার্থ নিয়ে ছুটাছুটি করছে। মনে হয় সবাই এখন জেলাভিত্তিক স্বাধীনতা চায়।

পাকিস্তানপ্রেমিরা তাদের বোল পাল্টে অনেকে ঘাপটি মেরে আছে। প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই ওরা আছে। এই সুযোগটা অনেকেই কাজে লাগাতে ব্যস্থ হয়ে পড়ল। একদিকে কিছু কর্মচারিকে উসকে দেয়, আর অন্যদিকে নিজেদের উদ্দেশ্য সমাধা করার কাজ হাতে নেয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকটা দুটা ভাগ হয়ে গেল। প্রথমে শুরু হয়েছিল রিটার্নি নিয়ে। শত শত রিটার্নি এসে ব্যাংকে যোগদান করল এবং তাদের সিনিওরিটি দাবী করল। স্থানীয় কর্মচারিরা তার বিরোধিতা করায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হল যেন আমরা আবার পাকিস্তানির সাথে দর কষাকষি করছি। তাদের কাজকর্মে মনে হল তারা যেন বাঙালি নয়, পাকিস্তানি। অনেকের এখনও পাকিস্তানপ্রীতির রেশ কাটেনি। তাদের গায়ে এখনও বিহারী বিহারী গন্ধ। এই রিটার্নীরা সব সময় যুদ্ধংদেহি মনোভাব নিয়ে কাজ করে। তাদের

আলাদা ইউনিয়ন গঠন করে দাবী আদায়ের স্মারক পেশ করে। দেখা গেল এই রির্টার্নিরা ৯০ ভাগ একটা বিশেষ জেলার মানুষ আর সেই জেলার মানুষ ডিপুটি গভর্নর নুরুল মতিন নিজেও রিটার্নী। সারাজীবনই তিনি করাচীতে কাজ করেছেন। তিনি ব্যাংকিংএ একমাত্র গোল্ড মেডালিষ্ট। ডিপুটি গবর্নর হিসেবে নিজ জেলার মানুষকে তিনি খুব ভালবাসেন এবং তাদের অযৌক্তিক দাবীকে ন্যয্য বলে মেনে নিতে চেষ্টাও করলেন। কিন্তু ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী তা হতে পারে না বলে গভর্নর অনুমোদন দেননি।

ফেব্রুয়ারিতে গভর্নর গেলেন আই এম এফ অধিবেশনে তিন মাসের জন্য। তখন নুরুল মতিন সাহেব হলেন গভর্নর-ইন-চার্জ। গভর্নরের সব কাজের দায়ীত্ব এখন তার হাতে। দায়ীত্ব হাতে পেয়েই তিনি শুরু করলেন তার কাজ। কয়েক সপ্তাহের মাধ্যে ঢাকা (হেড অফিস) অফিস থেকে অনেক বড় বড় অফিসার এবং বিভাগীয় প্রধানকে বিভিন্ন জেলায় বদলি করে দিলেন এবং তাঁর নিজের পছন্দের মানুষকে হেড অফিসে নিয়ে এলেন। ব্যাংকের প্রায় সব বিভাগের প্রধান করা হল তাঁর নিজের লোক। দেখা গেল এখন ব্যাংক চলবে সেই জেলার মানুষ দিয়ে। তার নিজের দলকে খুশি করার জন্য রাতারাতি তিরিশটা কাউন্টার খুলে তাদের তিরিশজনকে পদোন্নতি দিলেন। রিটার্নি সবাইকে তিনি সিনিওরিটি দিলেন। তার মানে হল যারা পাকিস্তানে বহুদিন চাকরি করেছেন অথচ তাদের কোন প্রমোশন হয়নি তারা এখন এখানে সিনিওর। একটা পদ খালি হলেই নাম আসবে রিটার্নীদের। আর বাংলাদেশে যারা এতদিন চাকরি করেছে তারা আগামী দুএক বছরের মাঝে পদোন্নতির আশা করতে পারে না। ইউনিয়ন তার প্রতিবাদ করল। রিটার্নী ইউনিয়নও বসে নেই। তারা তাদের কাজ বাদ দিয়ে সারাদিন বসে থাকে গভর্নরের অফিস ঘিরে আর একটার পর একটা কাজ করিয়ে নিচ্ছে। এক পর্যায়ে দেখা গেল কর্মচারির বেতন বন্ধ হয়ে গেছে। নুরুল মতিনের অযৌক্তিক কাজের প্রতিবাদে ক্যাশ বিভাগ কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। এখন আমরা বাংলাদেশের কর্মচারিরা ফরিয়াদ জানাব কার কাছে? যার কাছে ফরিয়াদ করব তিনি নিজেই তো এসব করে যাচ্ছেন বা করাচ্ছেন। এখন উপায় কি? গভর্নর ফিরে আসা পর্যন্ত বেতন না পেলে মানুষ চলবে কিভাবে? অতএব অপেক্ষা করা যায় না।

আমি আমার সাথে দুজন নিয়ে নুরুল মতিনের চেম্বারে ঢুকলাম। যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে জিজ্ঞেস করলাম, 'স্যার, অফিসে যে এতসব ঝামেলা হচ্ছে, কেউ কাজ করছেনা, সবাই আপনার অফিসের সামনে বসে থাকে, কর্মচারির বেতন দেয়া হয়নি, ইলেভেটর বন্ধ করে দিচ্ছে, এসব অনিয়মের কি ব্যবস্থা করছেন?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'আমার করার কিছু নেই'।

কিন্তু আপনি তো অনেক কিছু করছেন, এই যেমন রিটার্নীদের সিনিওরিটি দিয়েছেন, তিরিশটা কাউন্টার খুলে তাদের প্রমোশন দিয়েছেন, যারা অনেক বছর নিজেরা বাড়ী করে পরিবার পরিজন নিয়ে সুখে সংসার করছে, তাদের ছেলেমেয়ে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে, হঠাৎ করে তাদের বদলী করে দিয়েছেন, একবারও ভাবলেন না তাদের কোন অসুবিধা হবে কিনা। অথচ এই অনিয়মগুলো ঠিক করার জন্য আপনার করার কিছু নেই। তাহলে আমরা যাব কার কাছে?

গভর্নর সাহেব ফিরে আসুক, তারপর দেখা যাবে।

তাহলে আপনার এখানে প্রয়োজন নেই, আপনি পদত্যাগ করুন, বেরিয়ে যান অফিস থেকে! গভর্নর সাহেব ফিরে আসলেই অফিসে আসবেন।

তিনি এমন একটা প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ভ্যাবাচেকা খেয়ে তাকিয়ে রইলেন।

আপনি গাড়ীও পাবেন না। গভর্নর সাহেব আসলেই গাড়ী পাবেন। আমি ড্রাইভারকে বলে দিয়েছি সে আর আপনার গাড়ী চালাবেনা।

কয়েক সেকেন্ড তিনি ভাবলেন। মাথা নিচু করে উঠে দাড়ালেন। আস্তে আস্তে দরজার বাইরে এসে তাকালেন বিরাট ওয়েটিং রুমের দিকে। তিরিশ চলিশজন লোক বসে আছে। সবাই তার তোষামোদকারি,

রিটার্নী। যেন তাঁর দেহরক্ষি। অফিসের কাজ বাদ দিয়ে এখানে বসে আড্ডা দেয়, তাঁকে দিয়ে কাজ করায়। আমি মতিন সাহেবের পেছনে। আমার এক পকেটে একটা হাত। পেছনে আমার দুজন সাথি। মতিন সাহেব হয়ত তার তোষামোধকারিদের কাছ থেকে কিছু আশা করেছিলেন। সবাই একবার তাকাল। আমার পকেটে হাত দেখে কেউ টু শব্দটি করল না। হলওয়ে দিয়ে মতিন সাহেবকে অফিসের বাইরে নিয়ে বললাম, যান রিক্সা নিয়ে বাসায় যান। আপনাকে শ্রদ্ধা করতে পালামনা, কারন আপনি অন্যায় কাজ করেছেন। শাসক যখন অন্যায় করে তখন তার প্রতিবাদ এমনিভাবেই করতে হয়। আমাদের আর কোন উপায় ছিল না।

তিনি রিক্সা নিয়ে সোজা চলে গেলেন বঙ্গবন্ধুর কাছে। তিনি বঙ্গবন্ধুর সহপাঠি তা জানা ছিল না। বুদ্ধিজীবিরা বুদ্ধি খাটিয়েই কথা বলে। বঙ্গবন্ধুকে কি সব বললেন তিনিই জানেন। বঙ্গবন্ধু তৎক্ষনাত তাঁর স্পেশাল ব্রাঞ্চকে ডেকে আদেশ দিলেন। মৌখিক। কি আদেশ দিলেন তা তিনিই জানেন আর জানে স্পেশাল ব্রাঞ্চ।

স্পেশাল ব্রাঞ্চ মতিন সাহেবের পিএ-এর সাথে যোগাযোগ করে আমার সব বৃত্তান্ত সংগ্রহ করল। বলা বাহুল্য, মতিন সাহেবের পিএ ও একজন রিটার্নী এবং একই জেলার মানুষ। তিনি আমার খবরা খবর দেবার সময় কিছু দাড়ি-কমা যোগ বিয়োগ করে, কিছু শব্দ এদিক সেদিক করে যা দিলেন তাতে আমি একজন **সন্ত্রাসী** ছাড়া কিছুই নই। সেই মতে স্পেশাল ব্রাঞ্চ তাদের অভিযান শুরু করে দিল।

রাতে আমার খোজে সাতটা বাড়ীতে হানা দিল পুলিশ। আমি তখন বাসাবো থাকি। আমার বাসা, পাশের বাসা, আত্নীয়ের বাস, আমার কয়েকজন বন্ধুর বাসা সব মিলে সাতটা বাসায় হানা দিল পুলিশ। আমি তখন **টাঙ্গাইলের** একটি গ্রামে আমার বন্ধু রহমানের বাড়ীতে। ঘটনার পর সবাই বলল, তুই ঢাকার বাইরে চলে যা। কাছেই ছিল রহমান। সে বলল, আমাদের বাড়ীতে চলে যা। তুই তো চিনিস। দেরি করিস না। সেদিন বিকেলেই চলে গেলাম।

পরের দিন বিকেলে রহমান আসল তার বাড়ীতে। হাতে তিনটা খবরের কাগজ। প্রথম পাতায় লেখা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকে সন্ত্রাসীর হামলা, ডিপুটি গভর্নর আহত, কোনটায় লিখেছে বাংলাদেশ ব্যাংকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, গভর্নর বহিস্কৃত ইত্যাদি। খবর পড়ে হাসলাম। রহমান বলল, কাল এখান থেকে চলে যা অন্য কোথাও। কারন এক জায়গায় বেশিদিন থাকা ঠিক নয়। ধরতে পারলে তো উত্তম মধ্যম কিছু না কিছু জুটবেই। তাই সাবধানে থাকা ভাল।

আমার নামে কোন মামলা নেই। কারন কোন থানায় কোন ডাইরি নেই। যা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর মৌখিক আদেশে। এ মামলার রায় শুধু বঙ্গবন্ধুই দিতে পারেন। আমাকে ধরার জন্য আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু রায় দেননি।

পরের সপ্তাহে দৈনিক ইত্তেফাকে একটা উপসম্পাদকীয় বের হল। লিখেছেন আবেদ খান। তিনি ব্যাংকে সরজমিনে খোজ খবর নিয়ে এই লেখাটি লিখেছেন। অন্যন্য পত্রিকায় যেসব খবর ছাপা হয়েছে তার প্রতিবাদ অনেকটা। তাঁর লেখায় পরিষ্কার হল যে আমি সন্ত্রাসী নই, একজন মুক্তিযোদ্ধা। তার সাথে তিনি ব্যাংকের অনেক অনিয়মের কথাও তোলে ধরলেন। এই লেখার পর বাতাসটা আমার দিকে ঘুরে গেল। সন্ত্রাসী খেতাবটা কাটা গেল।

২৭ দিন এখানে সেখানে পালিয়ে বেড়ালাম। তারপর তোফায়েল আহাম্মদের সাহায্যে একটা তারিখ ঠিক হল। আমাকে বঙ্গবন্ধুর সামনে যাবার সুযোগ দেয়া হবে।

তোফায়েল ভাই বললেন, দেখ আমি কিন্তু কিছু বলতে পারবনা। আমার কাজ শুধু সামনে যাবার সুযোগ করে দেয়া। বাকি যা করার বা বলার তইই বলবি।

আমি তাতেই রাজি।

রাজি তো হলাম কিন্তু চিন্তায় ঘুম আসে না। আমি বঙ্গবন্ধুর মুখোমুখি দাড়াব! কি বলব! কিভাবে কথা বলব! চোখের দিকে তাকাতে পারব! তিন দিন পরই সেই তারিখ। এই তিন দিন কত রকমের কথা মনে মনে আওড়ালাম। কি প্রশ্ন করবেন? কি উত্তর দিতে হবে? কিভাবে কথা বলতে হবে! শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম সব কথার উত্তর খুব নরম সুরে দিতে হবে। চোখের দিকে তাকানো যাবেনা। হাত পা শক্ত রাখতে হবে। কাঁপতে দেয়া যাবেনা।

সেই অপেক্ষার দিনটি এল। তোফায়েল ভাই এক সময় আমাকে সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর চেম্বারে ঢুকে বললেন, এই আপনার আসামী হাজির। একজন মুক্তিযোদ্ধা। তার নিজেরও কিছু কথা আছে, বলতে চায়। বলে বেরিয়ে গেল।

আমি ফাঁসির আসামীর মত মাথা নিচ করে দাঁড়িয়ে আছি। আমি টের পাচ্ছি বাঘের দৃষ্টি আমার দিকে। কয়েক মুহূর্ত। একটা গম্ভীর আওয়াজ ভেসে এল, তুই বুড়া লোকটাকে মারলি কেন?

আমি তো মারিনি! (মনে মনে কতবার নরম সুর মুখস্ত করলাম। কিন্তু বলার সময় আমার সেই চিরাচরিত রুক্ষ স্বরই বেরিয়ে এল।)

আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে রয়েল বেঙ্গলের গর্জন - তুই জানিস কার সাথে কথা বলছিস?

আমাকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে, সঠিক নরম সুরে উত্তর দিতে হবে! অবশ হয়ে গেলে চলবে না। আমার কথা বলতে হবে! কাপড় ভিজিয়ে দিলে চলবে না। উত্তর একটা এসে গেল। সাহস সঞ্চয় হয়ে গেছে। বলে ফেললাম, আমি বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলছি, জাতির পিতার সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় তা আমি শিখি নাই।

মতিন কি মিথ্যা বলেছে?

তা জানি না। তিনি ইজম করেছেন! তাই অফিসে এত গন্ডগোল।

কী! ইজম করেছে? যা প্রমান নিয়ে আয়!

নিয়ে এসেছি, বলে আমার হাতে এক গাদা ফাইল বাড়িয়ে দিলাম।

এগুলো কি?

তিনি যে ইজম করেছেন তার প্রমান। একটা নয়, কয়েক ডজন। আর আপনি বলেছেন যুদ্ধে আমাদের তিরিশ লক্ষ লোক মারা গেছে। তাহলে আমাদের কাউন্টার বাড়বে না কমবে? তিনি রাতারাতি তার দলকে খুশি করার জন্য তিরিশটা কাউন্টার তৈরি করেছেন। তাতে আমাদের তিরিশ লক্ষ টাকা অপচয় হচ্ছে।

আর একবার গম্ভীর আওয়াজ। তোফায়েল!

তোফায়েল ভাই এসে হাজির।

ও কী বলে?

ও নিজের কথা বলে। আপনি তো তার কথা শুনেননি। এক পক্ষ শুনেছেন।

কয়েক মুহূর্ত চুপ। তারপর বললেন, যা আমাকে ইনকোয়ারি করতে দে।

তখন যে এত সাহস কোথা থেকে এল জানি না। বললাম, এখন আমি যাব কোথায়? গেলেই তো এ্যারেষ্ট করবে!

এ্যারেষ্ট করলে কি হয়? আমি জেল খাটি নাই? যা কয়দিন পালিয়ে থাক গিয়ে। আমাকে ইনকোয়ারি করতে দে।

মাথা নত করে খুশিমনে বেরিয়ে এলাম। এবার সুবিচার পাব।

বেরিয়ে এসে তোফায়েল ভাই বললেন, তোর তো সাহস কম না! কি উত্তর দিবে বলে বলে নাকি কান্না করছিলি, কিন্তু কথা বলার সময় তো খুব সাহসের সাথে বলেছিস। যা সাবধানে থাক গিয়ে। ইকোয়ারি শেষ না হওয়া পর্যন্ত লুকিয়ে থাক। পুলিশের হাতে গেলে অনেক ঝামেলা।

পরের দিনই ২৭ জনের একটা টীম বাংলাদেশ ব্যাংকে গেল। প্রথম ইনকোয়ারিতেই নুরুল মতিনকে বদলি করা হল আইডিবি-তে। ব্যাংকে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। অনেক গল্পও তৈরি হল। আমার কত ক্ষমতা! আমি মুজিব বাহিনীর লোক। আমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না। ইনস্পেকশন টীমকে আমরা অনেক তথ্য সরবরাহ করলাম। তৃতীয় ইনকোয়ারিতে নুরুল মতিন সাসপেন্ডেড। অনেকগুলো অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। অনেক জাজল্যমান প্রমান।

এদিকে আমার সাসপেনশন তুলে নেয়া হল এবং বকেয়া বেতন সহ সব পাওনা বুঝিয়ে দেয়া হল।

রিয়াজ মারামারিতে জড়িয়ে গেছে। পাড়ার ষোল ডিভিশনের ছেলেরা কি নিয়ে খুব বাহাদুরি করছিল। সে তাদের কাছে হার মানবে কেন। কয়েকটার মাথা ফাটিয়ে, হাত ভেঙ্গে এখন স্কুলে যাওয়া বন্ধ। যে কোন সময় আবার শুরু হতে পারে। ওরা একটু সুস্থ হলেই হল। ওরা সুস্থ হয়ে যখন জানতে পারল এটা আসল মুক্তিযোদ্ধা তখন তারা হার মেনে রিয়াজকে ওস্তাদ মেনে নিল। ওস্তাদ হবার পরই রিয়াজ আর স্কুলে যাবেনা বলে জানিয়ে দিল। তখন কেপ্টেন হারুনের কথা মনে পড়ল। তাঁর কথাই ঠিক হল। রিয়াজ আমার চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে।

আমার পদোন্নতির জন্য কাজ চলছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ কাজগুলো মিনিষ্ট্রি অব ফাইনেন্সের অনুমোদন লাগে। আমার পদোন্নতির ফাইল গেল মিনিষ্টি অব ফাইনেন্সে। ফাইলটা পৌছার পর ফাইল নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং চলল। আমার অতীত বর্তমান সবকিছুর তালিকা হল।

ফাইনেন্স সেক্রেটারি তখন ছিলেন কফিলউদ্দিন মাহমুদ। তিনি নুরুল মতিনের দূর সম্পর্কের আত্নীয় এবং একই জেলার মানুষ। কফিলউদ্দিন মাহমুদ তখন নুরুল মতিনের ফাইল নিয়েও কাজ করছে। কিছুদিনের মাঝে নুরুল মতিনের সাসপেনশন তোলে নেয়া হল এবং তাকে ব্যাংকিং ট্রেনিং সেন্টারে পোষ্টিং দেয়া হল। তাতে তার পদাবনতি হল। চাকরি বাচিয়ে রাখার জন্য তিনিও তা মেনে নিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়লেন।

অস্ত্র জমা হয়ে গেছে। রাজনৈতিক নেতাদের মুখের বুলি পাল্টে গেছে। গলার স্বর বদলে গেছে। এতদিন মুক্তিযোদ্ধার সাথে কথা বলার সময় একটা সমীহ ভাব নিয়ে কথা বলত, এখন নেতাসুলভ কথা বার্তা। দেশটা নেতারা স্বাধীন করেছে, স্বাধীনতার স্বাদ তারাই গ্রহন করবে। তারাই দেশের ভবিষ্যত হর্তাকর্তা। যা কিছু করার তারা এই নেতা পাতি নেতা তস্যু নেতারাই করবে এবং তারাই শুধু তারাই। কোথায় কোন মার্কেটে বিহারির দোকানপাট ব্যবসা আছে, কোথায় কোনখানে বিহারির বাড়ী, জমি জমা ছিল এসব খুজে বের করা এখন নেতাদের কাজ। তাদের হাতে ১৬ ডিভিশনের মুক্তিযোদ্ধা আছে, দখল করা একদম সোজা। কার কোন আত্নীয়কে কি দিতে হবে, কার চাকরি কোথায় হবে সব করবে এই নেতারা। এখন আসল মুক্তিযোদ্ধার হাতে অস্ত্র নেই অতএব ধমক দিলেও কিছু করার নেই। মুক্তিযোদ্ধারা যেন এক অসহায় জীব। যদি কোন মুক্তিযোদ্ধা এই নেতাদের মুখের উপর কথা বলে তাহলে দুদিন পর তার লাশটা পাওয়া যাবে খালের পাড়।

স্বাধীন বাংলায় এই প্রথম বিসিএস পরীক্ষা নেয়া হবে। আমি দরখাস্তের ফরম এনে সব ঠিকঠাক করে জমা দিব। একদিন আমার বসের সাথে কথা বললাম। তিনি বললেন, বাইরে গিয়ে আর লাভ কি? ব্যাংকেই তো আপনার প্রমোশন হয়ে যাচ্ছে। সবকিছু তো পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন মিনিষ্ট্রির অনুমোদন আসলেই হল। খুব শীঘ্রই এসে যাবে। একটু ধৈর্য্য ধরুন।

আমিও ভেবে দেখলাম কথাটা তিনি ঠিকই বলেছেন। তখনও জাতীয় পে স্কেল পরিবর্তন হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মচারির বেতন ছিল সবচেয়ে বেশি। যোগ্যতার মাপকাঠিও ছিল বেশি। চাকরির সুযোগ সুবিধা ছিল অনেক। তখন কে ভেবেছিল পেস্কেল হয়ে যাবে তেলে পানিতে একাকার।

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পদোন্নতির নিয়ম ছিল মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে একটা পদোন্নতি। আমি তখন ব্যাংকে সিনিওরিটি হিসেবে পদোন্নতির প্রথম সারিতে। সিনিওর হিসেবে আমার পদোন্নতি হবার পর যদি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পদোন্নতি হয় তাহলেই আমার কিছু প্রাপ্তি হয়। মিনিষ্ট্রি অব ফাইনেন্স এই সুযোগটা ব্যবহার করল। অবশ্য তার সাথে ব্যাংকে নুরুল মতিনের কিছু প্রেতাত্মাও মনে প্রানে কাজ করে সিনিওরিটির প্রমোশনের আগেই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রমোশন দিয়ে দিল। ফলে পরবর্তি প্রমোশনের জন্য সিনিওরিটি লিষ্টে আমি এখন সর্বকণিষ্ঠ। তার মানে পরবর্তি প্রমোশন কয়েক বছর লাগবে। দেখা গেল মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার এই প্রমোশন হল ঠিকই, কিন্তু কোন কাজেই লাগল না। এদিকে বিসিএস পরীক্ষার তারিখও শেষ হয়ে গেল। এখন উপায়! মনটা বিষিয়ে গেল। কাজ করার উৎসাহ হারিয়ে গেল। দিন রাত ভাবতে লাগলাম এখন কি করব!

কি করব কি করব ভাবতে কেটে গেল আরও কয়েকটা বছর। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ১৯৭৬ সালে আবার ব্যাংকে ঝামেল হল। উত্তেজিত কর্মচারিরা গভর্নর নাজির উদ্দিনকে অপদস্থ করে বের করে দিল। মামলা হল ২৭ জনের বিরুদ্ধে। দেখা গেল আমার নামটা প্রথম। অথচ আমি সেদিন অফিসেই ছিলাম না। খোজ খবর নিয়ে জানলাম নুরুল মতিনের প্রেতাত্মার কাজ। আমাকে ফাসাতেই হবে। তাই এখানে আমার নামটা প্রথম। মামলা স্থানান্তরিত করা হল মার্শাল ল কোর্টে। আসামি আমরা সাতাশ জন। মামলা মার্শাল কোর্টে স্থানান্তরিত করার উদ্দেশ্য হল, শাস্তি অবধারিত। আমরা সবাই কোর্টে আত্মসমর্পন করার পর জামিন দেয়া হয়নি। মামলা চলল তিন মাস। শেষ পর্যন্ত রায় হল “সসম্মানে বেকসুর খালাস”।

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলের বাক্যবান আর সহ্য হয়না। আগে থেকেই এসব প্রশ্ন শুনতে শুনতে কানে তালা দিয়েছি। সকলে একই প্রশ্ন করে, ওমক এত কিছু করে ফেলল, তুমি কি করলে? অমুক নেতার কাছে গেলেই তো তুমি অনেক কিছু করতে পার, যাচ্ছনা কেন? আগে নিজের জন্য কিছু কর তারপর সততা। নতুন করে এইসব শুনতে শুনতে আরও হতাশ হয়ে গেলাম। কোন কোন পরিচিত মানুষকে দেখে আমার নিজেরও খুব খারাপ লাগত। কতভাবে তারা স্বাধীনতা ভোগ করছে। অথচ তাদের ইতিহাস আমি জানি। নিজকে মনে হল আমি কত অসহায়। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম ব্যাংক ছেড়ে দেব।

ব্যাংক ছেড়ে যাব কোথায়! বিদেশ! কিন্তু টাকা কোথা পাব! কোন্ দেশে যাব! তিনটা দেশের কথা মনে মনে আওড়ালাম। আমেরিকা, লন্ডন অথবা মধ্যপ্রাচ্য। তখন পেট্রোরিয়ালের যুগ। বাঙালিরা বেশিরভাগই সেদিকে ছুটছে। সেখানে যাওয়াটা তখন অনেকটা সোজা।

বাংলাদেশে তখনও সৌদি আরবের কোন দূতাবাস নেই। ভিসা পেতে হলে অন্য দেশে যেতে হবে। হয়ত পাকিস্তান নয়ত ইন্ডিয়া অথবা ধারে কাছে অন্য কোন দেশে।

ব্যাংকের ডিপুটি গভর্নর জনাব আলী কবীর সাহেব আমাকে খুব স্নেহ করেন। একদিন তিনি বললেন, তুমি ব্যাংক ছেড়ে দাও। অন্য কোথাও চাকরি দেখ অথবা বিদেশ চলে যাও। আমি তোমাকে সাহায্য করব।

বললাম, আমি নিজেও একথাই ভাবছি। বিদেশ যেতে হলে টাকার প্রয়োজন। আমার এমন টাকা নেই যে বিদেশ যাব।

কত টাকা লাগে বিদেশ যেতে?

ভাবছি সৌদি আরব যাব। সেখানে গেলে হাজার দশেক টাকা হলেই চলে।

তুমি চেষ্টা করলেই এই টাকার ব্যবস্থা করতে পার।

আমি কি চেষ্টা করব! ভাবলাম ভাগিনা মিন্টুর কথা। তার এক ফুফা আছে রুপালী ব্যাংকে। অনেক ক্ষমতাবান।

একদিন মিন্টুর সাথে আলাপ করলাম। মিন্টু খুব খুশিমনে বলল, এখনই আমি ফুফার কাছে যাব। আপনার জন্য কিছু করতে পারলে নিজকে আমি ধন্য মনে করব।

মিন্টু রাতেই ফিরল। এসে বলল, ব্যবস্থা হবে। তবে একটা কাজ করতে হবে। সেটা হল, আপনার একটা জায়গা আছে। তার দলিলটা জমা রাখতে হবে। তার বদলেই আপনি টাকা পেয়ে যাবেন।
টাকার চিন্তা করতে করতে কোন কুল কিনারা পাচ্ছিলাম না। এত সহজে ব্যবস্থা হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। খুশিতে মনে মনে আকাশে উড়তে লাগলাম। দলিল জমা দিয়ে এক সপ্তাহের মাঝে টাকা হাতে পেয়ে গেলাম।
ভিসার জন্য ইন্ডিয়া যাব। তারপর সৌদি আরব। সব ঠিকঠাক করে ইচ্ছে হল লতিফ ভাইর সাথে দেখা করে যাই। অন্তত তাঁকে বলে যাই আমার অবস্থা এবং কেন দেশটা ছেড়ে যাচ্ছি। এই ভেবে একদিন তাঁর অফিসে গেলাম। তিনি তখন অনেক বড় পদে আসীন। আমাকে দেখেই বললেন, বস। অনেকেই আসে, কিন্তু তোমাকে দেখলাম না। এখন তো সব পারমিট বন্ধ হয়ে গেছে।
মনের ভেতর একটা ঝাকুনি অনুভব করলাম। এটা কি রাগ দু:খ ব্যাথা না আঘাত সেটা বুঝতে পারলাম না। আমি এসেছি উনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করতে, আর শুনতে হল পারমিট দেয়া বন্ধ হয়ে গেছে! তাহলে উনার কাছে যারাই এসেছে পারমিটের জন্যই এসেছে! আমি যদি পারমিটের জন্য আসি তাহলে বাহাত্তর থেকে সাতাত্তর এই পাঁচ বছরে আসিনি কেন? তিনি চায়ের অর্ডার দিলেন। বললাম, না চা আমি খাইনা, আর পারমিটের জন্য আমি আসিনি। আপনার সাথে অনেক দিন দেখা হয়না, খুব ইচ্ছে করছিল আপনার সাথে দেখা করি, তাই এসেছি। আপনার ভাই রঙ্গু এখন কোথায়? কি করে?
আমি জানি রঙ্গু এখন দামী গাড়ী, পোষাক পড়া ড্রাইভার নিয়ে চলে। একদিন ব্যাংকে দেখা হয়েছিল। এসেছিল বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনে। বলছিল কি সব বড় বড় ব্যবসা করে। কয়েক দিন পর পরই বিদেশে যায় ইত্যাদি। এই রঙ্গু আগরতলায় হোটেলে থেকে রাজনৈতিক মর্যাদা নিয়ে দিন কাটিয়েছে।
রঙ্গু তো এখন ব্যবসা করে। তোমার চাকরি কেমন চলছে?
ভাল। আচ্ছা চলি, আবার আসব বলে চলে এলাম। যা বলতে গিয়েছিলাম তা আর বলা হলনা।
সৌদি ভিসার জন্য দিলী পৌছলাম। জানতে পারলাম বাংলাদেশ দূতাবাস একটা চিঠি না দিলে ভিসা দেবে না। তাই আগে বাংলাদেশ দূতাবাসে ধর্না দিতে হল। দু সপ্তাহ লাগল চিঠি পেতে। এই দু সপ্তাহে অনেক কিছু দেখলাম জানলাম। টাকা দিলেই চিঠি পাওয়া যায়। মুক্তিযোদ্ধার চেয়ে রাজাকারের কদর বেশি। টাকা ছাড়াই তাদের চিঠি মিলে। এই কাহিনী বিশদভাবে লেখা হয়েছে আমার “কালো রক্ত” উপন্যাসে।
শেষ পর্যন্ত টাকা ছাড়াই চিঠি নিয়ে ভিসা পেলাম। পৌছলাম জেদ্দা শহরে। সেদিনই ওমরা করে পরের দিন থেকে চাকরি খোজা শুরু হল। চাকরি নেই তবে কাজ আছে। কাজ মানে লেবারের কাজ। কাজ করার এখনও অবস্থা হয়নি আমার। আগে চাকরির সন্ধান করে দেখি। না পেলে কাজ করব।
ভাগ্য সুপ্রশন্ন। একজন লোকের খোজ করতে গিয়ে চাকরি পেয়ে গেলাম। একবারে ম্যানেজার। তখন জেদ্দা শহরে কোন বাঙালি ম্যানেজার ছিল বলে জানা নেই। খবরটা বাংলাদেশ দূতাবাসেও গেল। আমাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য এসেছিলেন দুজন কর্মকর্তা। খবরটা ছড়িয়ে গেল।
অফিস ছুটির পর বাইরে এসে দেখি কয়েকজন লোক অপেক্ষা করছে। প্রথমে বাঙালি বলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়না। কারন তাদের পরনে সৌদি পোষাক। তাদের একজন এগিয়ে এসে করমর্দন করে বুকে বুকে লাগিয়ে কোলাকুলি শেষে নিজের পরিচয় দিল। তারপর একে একে সবাই কোলাকুলি শেষে পরিচয় দিল। বলল, আপনার কথা শুনেছি। তাই দেখা করতে এলাম।
এখন প্রায় প্রতিদিনই নতুন মুখ দেখি। এখন আর বাইরে অপেক্ষা করে না। ভিজিটর রুমে এসে অপেক্ষা করে।
একদিন এল লিডার গোছের একজন। তার সাথে নতুন পুরাতন মিলিয়ে ছয় সাত জন।

সকলের পরিচয়ের পর লিডার খুব বিনয়ের সাথে, হাত কচলিয়ে বলল, হুজুর আমাদের বাসায় একদিন তসরিফ নিলে আমরা খুব খুশি হব। আপনার সুবিধামত কোনদিন সময় হবে বললে আমরা এসে নিয়ে যাব।
আমার নিজেরও গাড়ী ড্রাইভার আছে। শুধু অফিসে আসা যাওয়ার জন্য। ছুটির দিন থাকেনা। বললাম, ঠিক আছে যাব। তবে যে কোন বৃহস্পতিবার। আধা বেলা অফিস, তারপর যাওয়া যাবে।
একজন বলল, আগামী বৃহস্পতিবার হুজুরের সময় হবে কি?
ঠিক আছে।
সেই বৃহস্পতিবার অফিস ছুটির পর বেরিয়ে দেখি চার পাঁচটা গাড়ী। সব গাড়ীতেই মানুষ। একটা গাড়ী একটু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, বাকীগুলো অনেক পুরনো। পরিষ্কার গাড়ীতেই আমার জন্য নির্দিষ্ট আসন ছিল। গাড়ীগুলো চলল। মনে হল আমি একজন রাষ্ট্রপ্রধান। গার্ড দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আধা ঘন্টার মধ্যেই আমরা পৌছে গেলাম। একটা একতলা দালান। তিনটা রুম। আমার বসার জন্য একটা চেয়ারের ব্যবস্থা হয়েছে। কারন তারা থাকে ফ্লোরে বিছানা করে। কোন আসবাবপত্র নেই। সৌদি ষ্টাইল। আমার আদর যত্ন এমনভাবে হল যেন বাদশাহ আকবর। প্রজাদের দেখতে এসেছে।
খাওয়াদাওয়ার পর গল্প চলল। কে কিভাবে কবে এদেশে এসেছে। বেশিরভাগই বলল দিলী থেকে ভিসা নিয়েছে। কেউ বলল পাকিস্তান থেকে। কে কোথায় কাজ করে এসব কথাও হল। হঠাৎ করে একজন প্রশ্ন করল, ব্যারিষ্টার সাহেবের সাথে হুজুরের পরিচয় আছে নাকি?
কোন্ ব্যারিষ্টার?
ব্যারিষ্টার আখতারুদ্দিন, তিনিই তো বেশিরভাগ মানুষের চাকরি দিয়েছেন। এখন সৌদিয়ার লিগেল এডভাইজার।
ও, ঐ রাজাকারের কথা বলছেন! ওর কারনেই তো সৌদি আরব এখনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নাই। সে দেশের শত্রু। চিনি, ষ্টেট ব্যাংকের লিগেল এডভাইজার ছিল।
হঠাৎ করে ঘরের পরিবেশ বদলে গেল। সবাই চুপ হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষন চুপচাপ বসে থেকে আমি বললাম, আচ্ছা এখন যাব। আপনাদের আথিতেয়তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। বলে আমি উঠে দাড়াঁলাম। দরজার দিকে রওয়ানা দিলাম। কিন্তু কেউ উঠছে না। আসার সময় এতগুলো গাড়ী ছিল, এখন নাই। আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতেও কেউ এলনা। আমি রাস্তায় এসে একটা টেক্সি নিয়ে বাসায় এলাম। বসে বসে অঙ্কটা মিলাতে চেষ্টা করলাম। আমার নামের আগে মোলা দেখে তারা ভেবেছিল আমি তাদের লোক। তারপর একটা কোম্পানীর মেনেজার, ইচ্ছে করলে ভিসার ব্যবস্থা করতে পারি। তাদের দলের সৌন্দর্য বেড়ে যায়। দল ভারি হয়। যখন দেখল আমি তাদের দলের নই, তখন দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়াটা তাদের আরও লোকসান।
দিলীর দূতাবাসের কাজকর্মের সাথে তাদের কথাবার্তাও মিলে যায়। স্বাধীনতার পর দিলী দূতাবাস বেশিরভাগ রাজাকারের ভিসার ব্যবস্থা করেছে। সৌদি আরবে বেশিরভাগ রাজাকার আশ্রয় নিয়েছে। তের বছর সৌদি আরবে থেকে মুক্তিযোদ্ধার সন্ধান পাইনি। নেই যে তা নয়, কেউ পরিচয় দিত না। কারন রাজাকারের মাঝে মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় দিয়ে ঘৃনার পাত্র হতে চায়না কেউ।
১৯৮৮ সালে চলে গেলাম নিউইয়র্ক। আগের পরিচিত দুএকজন ছিল। তাদের একজনের বাসায় উঠলাম। নিজের জন্য বাসা খুজে বের করলাম তিন চার দিনের মাঝেই। যার বাসা ভাড়া নিলাম তার বাড়ী চিটাগাং। নাম অহিদ। তার সাথে কনষ্ট্রাকশনের কাজ করে আরও কয়েকজন বাঙালি। তারা সবাই আমাকে সাহায্য করার জন্য উঠেপরে লাগল। জামান সাহেব নামে একজন একটা সোসাল সিকিউরিটি কার্ড দিয়ে বলল, আপাতত আপনার কিছুই নেই, এটা ছাড়া কাজ পাবেন না। আপাতত এটা ব্যবহার করতে পারেন। ইচ্ছে করলে নিয়েও নিতে পারেন। কার্ড নিলাম, কিন্তু ব্যবহার করতে হয়নি। এদের

সাথে আর একজন ছিল নামটা ভুলে গেছি, সে বলল আমার ছোট ভাই এসেছে আর্মি ট্রেনিংএ। চার বছরের জন্য। বাংলাদেশ থেকে একমাত্র একজনই সেলেক্ট হয়েছে এবং সেটা আমার ভাই।
শুনে খুব খুশি হলাম। একটা বাঙালি ছেলে আমেরিকায় এসেছে ট্রেনিং নিতে, এটা একটা সুখবর। বললাম, নিয়ে আসেন একদিন আমাদের এখানে। আমাদের সাথে খাবে একবেলা।
আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সন্তানকে যেদিন নিয়ে এল সেদিন সাথে ছিল জামান, অহিদ এবং ইকবাল। ছেলেটা দেখতে ছিপছিপে, সুন্দর চেহারা। বয়স আঠার উনিশ হবে। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি?
আজমী।
তুমি তো আমাদের ভবিষ্যত। দেশে ফিরে গিয়ে দেশের দায়ীত্ব গ্রহন করবে, হাতে থাকবে অনেক ক্ষমতা। তোমার রাজনৈতিক চিন্তাধারা কি?
আছে একটা।
সেটা কি? কোন্ দলের রাজনীতি তোমার নীতির সাথে মিলে?
জামাত। বলে একটু মুচকী হাসল। মুখের ভাব দেখে মনে হল এই কথাটা শুনলে আমি খুব শুশি হব। কারন আমি একজন মোলা।
আমি আকাশ থেকে পড়লাম। কাকে দাওয়াত করলাম! আর তার সাথে যারা এসেছে তারা কে! আমি তো একটা বোকা। এখন তো আর অপমান করা যায় না। কোন রকমে আথিতেয়তা শেষ করে বিদায় দিলাম। পরে জানলাম আজমী জামাতের মাওলানা নিজামীর ছেলে (এখন সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বহিস্কৃত)। আর জামান সেই জামান যার পুরো নাম শামসুজ্জামান, বুদ্বিজীবি হত্যাকারি কুখ্যাত খুনি রাজাকার।
কিছুদিন পর দেখলাম মুক্তিযোদ্ধা ঐক্য পরিষদ নামে একটা সংঘটন হচ্ছে। ইচ্ছে হল গিয়ে দেখি ওরা কি করতে চায়। সেই থেকে শুরু হল প্রায় সব কয়টা সংগঠনের সভায় যাওয়া। পেছনে বসে সব শুনি। দেখলাম এখানে মুক্তিযোদ্ধার অভাব নেই। অনেক। যাদের বয়স যুদ্বের সময় হয়ত ছিল আট দশ তারাও মুক্তিযোদ্ধা। প্রবাসে মুক্তিযোদ্ধা অনেক। তারা এই নিউইয়র্ক শহরে থেকে বিশ্বজনমত গড়ে তুলে আমাদের অনেক সাহায্য করেছে। তারা মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধের সময় যাদের কোন দেখা পাওয়া যায়নি আজ বিশ বছর পর তারাও দাবী করে মুক্তিযোদ্ধা। আসল মুক্তিযোদ্ধা বেশ কিছু আছে। তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে কিছু অমুক্তিযোদ্ধা নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা বলে দাবী করে এবং আসল মুক্তিযোদ্ধারা তাদের দাবীকে মেনে নেয় দল ভারি করার জন্য। পরবর্তিতে বেশ কয়টা সংগঠন জন্ম নিল। একটা বিএনপি সমর্থন করে, আর একটা আওয়ামীলীগ। দেখা গেল একটা প্রতিযোগিতা চলছে। কোন কোন সংগঠন মুক্তিযোদ্ধাকে পুরস্কৃতও করছে। নিজেদেরকে প্রকাশ করার জন্য, কাগজে তাদের নাম আর ছবি ছাপার জন্য তারা সব চেষ্টা করে যাচ্ছে। কে যে আসল মুক্তিযোদ্ধা তা বুঝা মুস্কিল হয়ে পড়ল। তখন আমার ইচ্ছে হল প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধ আসলে কারা করেছে। তাদেরকে খোজে বের করতে হবে এবং তাদের যথাযোগ্য সম্মান দিতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ জানে না মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীর দান কত। তারা কি করেছে। দীর্ঘ ছয় বছর সময় নিয়ে আমি যোগার করেছি সত্যিকার ইতিহাস। লিখেছি “স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক”। তাতে এইসব দেশপ্রেমিককে আর কিছু দিতে না পারি অন্তত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পারি, একটা ধন্যবাদ দিতে পারি। বড় কথা তাঁরা অমুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে হারিয়ে যাবে না।
নিউইয়র্ক ছেড়ে কানাডায় আগমন। এখানে এসে কোন সংগঠনের সভায় যাই না। মাঝে মাঝে পত্রিকায় দেখি মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিচারণ ছাপা হয়। এসব নিয়ে মাথা ঘামাইনা। কি লাভ এসব নিয়ে কথা বলার। যে যেভাবে পারে সেভাবে চালিয়ে যাক তাতে আমার কিছু যায় আসে না।
আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা যায়। এক: অস্ত্র নিয়ে যারা সরাসরি যুদ্ধ করেছে। দুই: রাজনৈতিক নেতাদের আত্নীয়স্বজন যারা কিছুই করে নাই, পরবর্তিতে

‘সাংঘাতিক’ মুক্তিযোদ্ধা। তারাই স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহন করেছে। তিন: দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা বিনিময়ে যারা কিছুই চায় নাই এবং পায়ও নাই। যুদ্ধশেষে যার যার বাড়ীতে চলে গেছে। কেউ তাদের খবরও নেয়নি। এখন তাদের কেউ কেউ রিক্সা চালায়, বিনা চিকীৎসায় মারা যায়। চার: সুবিধাবাদি মুক্তিযোদ্ধা যারা যেখানে সুবিধা পেয়েছে সেখানেই নিজকে বিক্রি করেছে এবং আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। পাঁচ: ষোল ডিভিশন মুক্তিযোদ্ধা যারা লুট সন্ত্রাস খুন আর অসামাজিক কাজ করে মুক্তিযোদ্ধার নামে কলঙ্ক ছড়িয়েছে। ছয়: সার্টিফিকেটধারী মুক্তিযোদ্ধা যারা সার্টিফিকেট যোগার করে অফিস আদালতে সুবিধা নিয়েছে। সাত: আহত মুক্তিযোদ্ধা। তাদের দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যারা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত অবস্থায় আহত হয়েছে। আর এক ভাগ আহত মুক্তিযোদ্ধা যারা যুদ্ধে যায়নি অথচ আহত হয়েছে। তাদের কেউ কেউ হয়ত যুদ্ধে যাবার ইচ্ছেও ছিল না। দেশের ভিতরেই আত্মরক্ষার্থে পালিয়ে থাকা অবস্থায় জলাদ বাহিনীর হাতে ধরা পরে প্রান দিয়েছে, কেউ কেউ অমানুষিক অত্যাচারে আহত অবস্থায় প্রাণে বেচে গেছে। তাদের কেউ কেউ মিডিয়ার সাথে জড়িত বলে তাদের নাম সারা দেশে বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। অথচ যুদ্ধে যাবার কোন ইচ্ছে ছিলনা তাদের। তারপর আছে স্বঘোষিত মুক্তিযোদ্ধা। এই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রবাসেই দেখা পাওয়া যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের নামের আগে বা পেছনে থাকে তাদের পদবী, মুক্তিযুদ্ধে কৃত্তিত্বের জন্য খেতাব ইত্যাদি। নামের আগে থাকে বীর, সাহসি বা অন্য কোন বিশেষন। কানাডায় এসে দেখা পেলাম “মহা” মুক্তিযোদ্ধার। এটাই বোধ হয় শেষ বিশেষন শুনলাম। আগে কখনও কোথাও শুনিনি।